পুরুষ পার্বণ
পত্রিকা

প্রথম সংস্করণ
২০২৫

পুরুষের সাথে পুরুষের পাশে

With Best Compliments from :

ভূতের রাজা দিল বর ®

Bhooter Raja Dilo Bor

An Authentic Bengali Cuisine Restaurant

since 2005

BAWARCHI ®

since 1999

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	নন্দিনী ভট্টাচার্য	১
পুরাণ কথা	নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী	২
শরীরের সাতকাহন (স্বাস্থ্য)	ডঃ কৌশিক লাহিড়ী	২২
গল্প অল্প স্বল্প	বিনোদ ঘোষাল	২৬
ব্যবসা ও বিনিয়োগ	পার্থ হালদার	৩২
কবিতার পাতা	সুবোধ সরকার	৩৬
চলতি কা নাম গাড়ি	শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়	৩৭
এই একলা পথ	La exotic	৪০
রম্যরচনা	প্রকল্প ভট্টাচার্য	৪৩
বেআইনি আইনি	জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৫
বিনিয়োগের হাল হদিশ	অমিতাভ গুহ সরকার	৪৯
জীবনের অস্তরাগে	ডঃ ধীরেশ চৌধুরী	৫৪
অন্যকণ্ঠ	রাহুল মিত্র	৫৭
তোমায় সাজাবো যতনে	সোনা সেলিব্রিটি মেকআপ আর্টিস্ট	৫৯
দাদার হেঁসেল	ফুডকা	৬০
কবিতার পাতা	শতায়ূ মুখার্জি	৬৫
মন নিয়ে - লাইন টেনে বাঁচুন	ডঃ পম্পা মৈত্র	৬৬
সংখ্যার সঙ্গে সখ্য	অনির্বাণ ব্যানার্জী	৬৮
বায়স্কোপ / টোপ	প্রসেনজিত বিশ্বাস	৭০
ব্যবসা বিনিয়োগ	জয়ন্ত চৌধুরী	৭৩
শরীরের সাতকাহন	মৃণাল বিশ্বাস	৭৫
খেলা - ঘরে বাইরে	অনির্বাণ সিনহা	৭৯
মানুষ মানুষের জন্য	ডাঃ শুভম মুখার্জি	৮০

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
নন্দিনী ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা
অনিন্দ্য ভট্টাচার্য্য, পার্থ হালদার, অনির্বাণ সিনহা, অরিন্দম ব্যানার্জী

চিঠিপত্র ও যোগাযোগের জন্য
FA39, 1822, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata - 700 107
Opp. GST Bhaban
9007557333 / 7003777280 / 7003624865
e-mail : purushparbon@gmail.com

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি
মৃন্ময় চৌধুরী
অভিজিত ডিউক দাস
মৃন্ময় সরকার

facebook : purushparbon

নন্দিনী ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত
FA39, 1822, Rajdanga Main Road, Kolkata - 700 107

মুদ্রণ ও প্রকাশনে
Impressions - 9830210148

মূল্য - ৪৯.০০
ডাকযোগে পাঠানো হলে অতিরিক্ত ১.০০

An Initiative of

All Bengal Men's Forum

সম্পাদকের কলমে

— নন্দিনী ভট্টাচার্য
সম্পাদক
পুরুষ পার্বণ

অনেকদিন ধরে অনেকেই আমাদের বলে এসেছেন ছেলেদের জন্য একটি পত্রিকার কথা। পুরুষের বেসিক একটি গান তৈরী হবার পর তো এ জিজ্ঞাসা ও চাওয়া আরো বেড়েছে। আমরা অনেকদিন ধরেই এরকম একটি পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা অনেক। আপনাদের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় সেসব খানিকটা কাটিয়ে উঠে এবার আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিতে চলেছি বাংলাভাষায় পুরুষদের প্রথম Lifestyle Magazine ''পুরুষপার্বণ''। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন ''নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার, কেন নাহি দিবে অধিকার'' তেমনি তিনি এও বলেছেন ''ওলো সই ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে তোদের মতো মনের কথা কই''। আমাদের মনে হয় এ কিন্তু পুরুষ মনের আকুতি। মনের কথা তেমন করে না জানাতে পারার না বলতে পারার কষ্টের কথা। ''পুরুষপার্বণ'' হয়ে উঠুক তাঁদের মনের সেই আয়না, তাঁদের নিজস্ব মনের বসত এটাই চাওয়া। আগেকার দিনে মেয়েরা শুনেছি 'গঙ্গাজল', 'চাঁদের আলো', 'বকুল ফুল' পাতাতেন মনের কথা বলার জন্য। পুরুষ মানুষের এরকম কিছু পাতাবার কথা শুনেছেন কখনও ? এবার হয়তো সে সুযোগ হয়ে উঠবে আপামর বাঙালি পুরুষের। মনের কথা বলার ও শোনার।

এটি প্রথম সংখ্যা। এ বছর আমরা ৩টি সংখ্যাই প্রকাশ করবো। নববর্ষ সংখ্যা। পুজো সংখ্যা। পুরুষ দিবস সংখ্যা। এ সংখ্যায় থাকছে অনেক পরিচিত ও নামী মানুষের কলম।

ভালো লাগছে এটা ভেবে যে আমাদের একটি স্বপ্ন সাকার হোলো। বাকি দুটো পুরুষ কমিশন ও একটি পুরুষাশ্রম এর স্বপ্ন দেখে চলবো এখনো। অনেক পরিচিত মুখ যখন এই পত্রিকার জন্য কলম ধরেন তখন আশা জাগে আমাদের অন্য স্বপ্নগুলোও পূরণ হবে।

আপনাদের সবার শুভকামনা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকবে এই আশা।

#জয় পুরুষের জয় !

#পুরুষের হকের লড়াই !

ম্যায়নে দেখা হায় বহোত্ ফিরভী বহোত্ কম দেখা।

— নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

বিষ্ণুবাবুর তিরস্কার মাথায় রেখে আমি প্রথমে কালিদাসেরই অন্য মহাকাব্যগুলির মধ্যে 'যৌবন'-শব্দের প্রয়োগ এবং তার শব্দার্থ-বিচারে মন দিলাম। কালিদাসের শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য রঘুবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রামচন্দ্র যেখানে লঙ্কাযুদ্ধ-জয়ের পর সীতার সঙ্গে পুষ্পক-রথে চড়ে আকাশ-পথে ফিরছেন, তখন তিনি তাঁদের বনবাস-কালের সাময়িক আবাস-স্থলগুলি দেখাচ্ছিলেন সীতাকে। দেখাতে দেখাতে ভাগীরথী গঙ্গার দেখা পান রামচন্দ্র। গঙ্গার বর্ণনা করতে গিয়ে রামচন্দ্র সীতাকে বলছেন — গঙ্গানদী থেকে যে মাতাল মিষ্টি হাওয়া উঠে আসছে, সেটা যেন তোমার মুখে ফুটে-ওঠা ঘর্ম বিন্দুগুলি শুকিয়ে দিচ্ছে যেন, তবে এই হাওয়াটা মধ্যাহ্ন-কালের হলেও গঙ্গার অতি-সুশীতল জলের সংস্রবে শীতল হয়েই তোমার মুখে এসে লাগছে —

আকাশ-বায়ুর্দিন-যৌবনোত্থান্।
আচামতি স্বেদলবান্ মুখে তে।।

এখানে আমাদের নজরে থাকার প্রধান শব্দটা হল — 'দিন-যৌবন' — অর্থাৎ একটি 'দিনের যৌবন'। কথাটা metaphorically বলা হলেও রঘুবংশের টীকাকার মল্লিনাথ 'দিন-যৌবন' শব্দটির অর্থ করেছেন 'মধ্যাহ্ন' অর্থাৎ যে সময়ে সবচেয়ে তপ্ত হয়ে ওঠে দিন। তাহলে 'যৌবন' মানে নবযৌবনও নয়, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনও নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় — 'ফুটি ফুটি ফুটে না'-ও নয়, যৌবন মানে একেবারেই রবীন্দ্রনাথের গানে — 'আজি কমল মুকুল দল খুলিল / দুলিল রে দুলিল—'। তার মানে, যৌবন হল পূর্ণ-ফুল্ল শতদল।

এবারে মনে হল, কালিদাস যে যৌবনের সঙ্গে 'কুসুম' বা ফুলের সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন, সেটা সংস্কৃত সাহিত্যে খুব পরিচিত এবং অভ্যস্ত উপমান। কালিদাসেরই অপর মহাকাব্য সেই 'কুসুম' এবং 'যৌবন' দুটোই একাধারে একই শ্লোকে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে বোঝা যায় যৌবন শব্দটার আক্ষরিক কোনও অর্থই হয় না, যৌবন শব্দটা আসলে স্ত্রী-শরীরের স্বভাবগত-ভাবে উপজাত কতগুলি উদ্ভেদ, যার সমষ্ঠিগত ব্যঞ্জনা, যেগুলি স্ত্রীলোকের ষোলো বছর বয়সংকালে প্রকট হয়ে ওঠে। ষোলো বছরের মতো একটা একটা কর্তিত কালবিভাগ এইজন্য করলাম যে, সংস্কৃতের সেই প্রাবাদিক শ্লোক অনুসারে পনেরো বছর পর্যন্ত পুরুষ-নারী সকলেরই কৈশোর কাল এবং তার পরেই যৌবনারম্ভ — কৈশোরম্ আপঞ্চদশাদ্ যৌবনং তু ততঃ পরম্।

এছাড়াও এই প্রশ্নটাও উঠবে যে, যৌবন বোঝাতে স্ত্রী-শরীরের কথাই শুধু বললাম কেন, পুরুষেরও তো যৌবন আসে। উত্তরে, প্রথমত জানাই — পুরুষের যৌবন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বিশেষ-বিশেষ পুরুষ ছাড়া female-gaze -এর কোনও প্রশ্নই আসে না এবং সেই বিশেষত্বও পুরুষের যৌবন-সুঠাম চেহারা

ঘিরে যতখানি, তার চাইতেও বেশী অন্য কিছু সম্ভবত। তাছাড়া যৌবনারম্ভেও রমনী-শরীরের মতো পুরুষের শরীরে কেশ-স্তন-জঘনের কোনও উদ্ভেদ তৈরী হয় না। ফলত যৌবন-শব্দের প্রধান তাৎপর্য স্ত্রীলোকের শরীরেই নিহিত বলে সংস্কৃতে 'যৌবন'-শব্দের আক্ষরিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের সময় পুরুষদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলা হয়েছে — 'যৌবন' মানে যুবতীর ভাব। অথচ এটাকে তো যুবকের ভাবও বলা যেতে পারত। কিন্তু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ওইরকম শব্দাভিজ্ঞ কোষকার যৌবন শব্দের অর্থে পুরুষের দিকে তাকিয়ে বলেছেন — যুবকর্ম — অর্থাৎ পুরুষের ব্যাপারে যৌবন মানে কাজের কথা। এবার মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ হরিচরণ যৌবন শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করে বললেন — যৌবন মানে হল 'যুবতিভাব, তরুণীবয়ঃ।

হরিচরণের এই শব্দার্থবোধ আমাকে এইটুকু শিক্ষা দিয়েছিল যে, তাঁর মতো বিদ্বান কোষকার সংস্কৃতের কোনও আকর-গ্রন্থে এমন অর্থ না দেখলে যৌবন-ব্যাপারটার মধ্যে একান্তভাবে যুবতীদেরই অধিকার স্থাপন করতেন না। আসলে অথর্ববেদের একটি মন্ত্রাংশে বলা হয়েছে — যৌবনে জীবান্ উপপৃঞ্চতি জরা। এই মন্ত্রে একজন মৃত ব্যক্তির স্বর্গলাভের জন্য ব্রাহ্মণকে একটি বহু-দুগ্ধবতী গাভী দান করা হচ্ছে এবং সেই গাভীটির প্রশংসা করে বলা হচ্ছে — এই গাভীটি বুড়ো হয়ে গেলেও যেন যৌবনের মতো জীবন লাভ করে। অর্থাৎ যৌবন-কালেই তো এই ভাবনা থাকে যে, এই লোকটি আরও অনেক দিন বাঁচবে। সেই ভাবনাতেই বলা হচ্ছে যেন গাভীটি বুড়ো হয়ে গেলেও যৌবনকালের মতো দুগ্ধদায়িনী হয় — টীকাকার সায়নাচার্যের কথায় — গাভীটি বার্ধক্যে জরাস্পৃষ্ট হলেও তাকে যেন মনে হয়, সে তখনও যৌবন-ভাবেই রয়েছে — যৌবনে বর্তমানা ইব জীবাৎ জীবতু — তখনও যেন অনেক দিন বাঁচে।

আমাদের বক্তব্য কিন্তু এই গাভীটির বাঁচা-মরা নিয়ে নয়, কথাটা 'যৌবন' নিয়ে। অথর্ববেদের এই মন্ত্র ব্যাখ্যা করে গম্ভীর টীকাকার সায়নাচার্য হঠাৎই গাভীর প্রসঙ্গে 'যৌবন'-শব্দের অর্থ করে বললেন — যৌবন মানে যুবতীর ভাব — যুবত্যা ভাবো যৌবনম্। তাহলে তো এই মহাবিদ্বান সায়নাচার্য সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠবে যে, ইনিও কী স্ত্রী-শরীরের উচ্চাবচ ভাবনা মাথায় রেখেই 'যৌবন'-শব্দের অর্থ করেছেন যুবতীর ভাব; তা নইলে তাঁর তো বলা উচিত ছিল — যুবকের ভাব। তবে এই দুটি বিশ্লেষণেই এখনকার প্রগতিবাদিনীদের আপত্তি থাকত। যৌবন মানে 'যুবতীর ভাব' বললে 'অবজেকটিফিকেশন'-এর প্রশ্ন আসত। আবার 'যুবকের ভাব' বললে পৌরুষেয় পক্ষপাতে 'জেনডার বায়াস'-এর প্রশ্ন আসত। হয়তো বা সায়নাচার্য চতুর্দশ খ্রিষ্টাব্দেই এই সঙ্কট বুঝেছিলেন বলেই যৌবনের সংজ্ঞায় প্রথমত 'যুবতীর ভাব' কথাটা বলেই আবারও দুই পক্ষের সন্তুষ্টি ঘটিয়ে সাধারন সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন — যৌবন মানে শরীরের মধ্যাবস্থা — যৌবনং নাম শরীরস্য মধ্যাবস্থা।

তবে এইভাবে শুক-শারীর দ্বন্দ্ব মিটে গেলেও সায়নাচার্য যে যৌবন বলতে স্তন-জঘনবতী স্ত্রীলোকের শরীরই বুঝিয়েছেন এবং তাতে যদি সেই 'অবজেকটিফিকেশন'-এর প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই কঠিন শারীরিক সত্যটা মেনে নিতেই হবে যে, মনুষ্য-জগতে একমাত্র স্ত্রী-শরীরেই সেই 'অবজেক্টগুলি' আছে, যার ফলে 'অবজেক্টিফিকেশন' সম্ভব হয়। 'অবজেক্ট' না থাকলে তো আর 'অবজেক্টিফিকেশন' হবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, যে-সব পন্ডিত এবং পন্ডিতানী স্ত্রী-শরীর-বিশেষে 'অবজেক্টিফিকেশন'-এর কথা ভাবেন, তাঁরা 'অবজেক্ট' কথাটা বড়োই সাধারণ এবং আক্ষরিক অর্থে ভাবেন। কিন্তু যে সব দার্শনিকেরা মনুষ্য-শরীর নিয়ে

খুব তলিয়ে ভেবেছেন, তাঁরা বলেন — স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে মনুষ্য-শরীর বস্তুটা এতটাই জটিল যে, কখনও সেটা 'অবজেক্ট' হয়ে ওঠে, আবার কখনও বা সেটা 'সাবজেক্ট' এবং 'সাবজেক্ট'-এর পারস্পরিকতার মধ্যে এমন জটিলতা তৈরী হয়েছে যে, সেখানে Descartes, Candillac থেকে শুরু করে Bergson, Mearleau-Ponty অবশেষে Jean-Paul Sartre-কেও কলম ধরতে হয়েছে Being and Nothingness-এর মতো বিখ্যাত বইটিতে এবং সেখানে বইটার তৃতীয় অংশ দ্বিতীয় অধ্যায় জুড়ে শুধু যে বিষয়ে আলোচনা, সেটা হল — The Body.

সার্ত্রের আলোচনার প্রথমেই তো একটা ধাক্কা আসবে, যেখানে তিনি লিখছেন — Of course, the discovery of my body as an object is indeed a relation of its being. But the being which is thus revealed to me is its being for others. আমি সার্ত্রের এই দেহতত্ত্ব বোঝাতে চাইলে আমার প্রস্তাবিত বিষয় থেকে অনেক দূরে চলে যাবো, তার চাইতে অতি সংক্ষেপে সেই পন্ডিতানীদের কথায়-কথায় objectification কথাটার প্রায়োগিক আতিশয্যের প্রতি খানিক অশ্রদ্ধা পোষন করে শুধু এইটুকু বলি যে, মানুষের দেহতত্ত্ব অত সহজবোধ্য বস্তু নয়, তার মধ্যে আবার স্ত্রী-শরীর! আমাদের দেশে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ, দেহাত্মবাদ অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধির ভাবনা নিয়ে যত দার্শনিক তত্ত্ব আছে, তার তর্ক-যুক্তি আছে, তা বোঝানোর বিপন্নতা যে কতখানি, সেটা আমরা স্বয়ং সার্ত্রের সামান্য একটা মন্তব্য থেকেই বুঝতে পারি।

সার্ত্রে যখন তাঁর দেহ-তত্ত্বের ভাবনা দার্শনিক-ভাবে বোঝাতে চাইছেন, তখন তাঁর বিচারের স্বভাবিত সূক্ষ্মতায় নিজেই বিব্রত বোধ করে পূর্বজ দার্শনিক Rene Descartes-এর বক্তব্য উদ্ধার করে বলছেন — "The soul is easier to know than the body". কাজেই কথায় - কথায় স্ত্রীলোকের ব্যাপারে পুরুষদের লক্ষ্যভেদী দৃষ্টির কথা পৌনঃপুনিক-ভাবে উল্লেখ করার আগে স্বয়ং সার্ত্রের ভাবনা প্রকাশ করছি Dermot Moran -এর জবানীতে। Moran লিখছেন —

Flesh is "the pure contingency of presence" (BN 343/410).10 More importantly. my flesh constitutes the other's flesh, especially in the acts of touching and caressing:

The caress reveals the Other's flesh as flesh to myself and to the Other...... It is my body as flesh which causes the Other's flesh to be born (quit fait naitre la chair d'anarui). (BN 390/459-60)

I have one kind of knowledge of the body within my experience and another experience of the body given from the perspective of the other: the body as it is "for me" and the body as it is "for others" or "for the other" (pourl'autrui). These two dimensions are, accordingto Sartre, "incommunicable" and "irreconcilable":

"Either it [the body) is a thing among other things, or else it is that by which things are revealed to me. But it cannot be both at the same time. (BN304/366)"

স্পর্শ কিংবা আলিঙ্গণের ক্ষেত্রে সার্ত্রের 'অন্য'-জনও যেমন একভাবে subjectivity-র জায়গায় পৌঁছে যান, কিন্তু পৌরুষেয় দৃষ্টির ব্যাপারে তিনি তেমন পরিষ্কার নন — 'sartre's unique description of "the look is incomplete" — তবে গবেষকের এই অজীর্ণ মতের সঙ্গে আমরা খুব একমত নই। তার

কারণ — সার্ত্রের ভাষা এত জটিল এবং সুন্দর যে, সেটাকে ভাষার গহনে না বুঝে ওঠাটাই খুব সহজ। আর বিশেষত তাঁর ওই কথার লব্ধ — the other. দৃষ্টির ব্যাপারে মেয়েদের ওপর পুরুষের দৃষ্টির কথা তিনি প্রায় বলেনই না, ফলে 'the other' ব্যাপারটা এমনই 'সাধারণ' অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে, যেখানে নারী-পুরুষের অদ্ভুত এক অদ্বৈতবাদের প্রশ্ন চলে আসে। সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল — সার্ত্রে প্রায় কখনওই মেয়েদের কথা আলাদা করে বলেন না, বেশীরভাগ সময়েই একের সম্বন্ধে অন্যের পারস্পরিক অস্তিত্বের ভাবনা।

অবশ্য Being and Nothingness-এ The Look' অধ্যায়টি যখন আরম্ভ করছেন, তখন প্রথমেই সাবত্রিক প্রগতি-ভাবুকদের কথা মেনেই তিনি মেয়েদের নিয়ে কথা আরম্ভ করে বলছেন ঃ

This woman whom I see coming toward me, this man who is passing by in the street, this beggar whom I hear calling before my window, all are for me objects – of that there is no doubt.

কিন্তু এর পরেই যখন সার্ত্রে এই দৃষ্টি-বিশ্লেষণের তাৎপর্য-বিস্তারে যাচ্ছেন, তখন দার্শনিক বুদ্ধিতে এই 'অবজেক্টিভিটি' অন্য এক মাত্রায় পৌঁছচ্ছে। সার্ত্রের বক্তব্যটা এখানে বাংলা তর্জমায় বোঝাতে চাইলে আমার এবং আপনার কাছে একেবারেই অবোধ্য-ভাবে গুলিয়ে যাবে। তাই যাঁর মূল লেখাটা ইংরেজিতেই উদ্ধার করছি এবং সেটা পড়তেও আপনাদের ধৈর্য্যের ওপর আস্থা রাখছি।

Now at last we can make precise the meaning of this upsurge of the Other in and through his look. The Other is in no way given to us as an object. The objectivation of the Other would be the collapse of his be-ing-as-a-look. Furthermore as we have seen, the Other's look is the disap-pearance of the Other's eyes as objects which manifest the look. The Other can not even be the object aimed at emptily at the horizon of my be-ing for the Other.

First, the Other's look as the necessary condition of my objectivity is the destruction of all objectivity for me. The Other's look touches me across the world and is not only a transformation of myself but a total metamorphosis of the world. I am looked-at in a world which is looked-at. In particular the Other's look, which is a look-looking and not a look-looked-at, denies my distances from objects and unfolds its own dis-tances. This look of the Other is given immediately as that by which dis-tance comes to the world at the heart of a presence without distance.

সার্ত্রের এই বিশদীভূত ভাবনার নিরিখে স্ত্রী-বিষয়িনী গবেষণার অন্য একটি মাত্রাও কিন্তু তৈরী হয়েছে। ১৯৭০-এর সেই স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলনের পর জেনডার-স্টাডি-র ব্যাপারটা গবেষণার জগতেও এক বিরাট জায়গা করে নিয়েছিল। আর সেই বিবর্তিত সময়কালেই ১৯৭৫-এ Laura Mulvey-র সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ — Visual Pleasure and Narrative Cinema একটা বিশেষ কথার লজ্জাই তৈরী করে দিল, যার নাম Male gaze এবং সেটারই প্রধান উপকরণ হল objectification of the female body. তদবধি পৃথিবীতে অভিজাত যত পত্র-পত্রিকা, গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-চক্র, অশেষ রমনীকুলের সাহঙ্কার শরীর-ঘোষনা —

'অবাক হ'য়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না —
পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে — ব্যবহৃত — ব্যবহৃত — ব্যবহৃত — ব্যবহৃত হ'য়ে
ব্যবহৃত — ব্যবহৃত —
আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠলোঃ
ব্যবহৃত — ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?

আসলে পৃথিবীতে অনেক নিসর্গ-সুন্দর, বিশেষত রমনী-শরীর, যতখানি 'মাছির মতো কামনা'-য় নষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশী নষ্ট হল বুঝি এই অভিজাত রমনীদের অতি-আত্মসচেতন দৃষ্টি-বিদ্বেষে — আশ্চর্য, সেই বিদ্বেষ তাঁদেরই অপরার্দ্ধের প্রতি — যারা তাঁদের সৃষ্টি করেছিল — বিধাতার সৃষ্টির পরেও সে আর এক সৃষ্টি, যা সত্যিই পুরুষের একান্ত নির্মাণ —

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী —
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।

আমার আর এক মহাকবি কিন্তু বাস্তবতার কল্পসূত্র থেকে জানেন যে, রমনী-শরীর পুরোটাই এমন নিরঙ্কুশ কোনও অলৌকিক রসশাস্ত্রীয় কল্প নয়, যেখানে পুরুষ শুধু দূরত্বের নান্দনিকতায় বসে থাকতে পারে অপেক্ষায়। রবীন্দ্রনাথকেও অর্ধ-পংক্তিতে স্বীকার করতে হয়েছে যে, তাঁর 'মানসী' কিন্তু 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। তার মানে, কবিজনের শিষ্ট কল্পনার সঙ্গেও যে এখানে শরীরের মোহময় অনুষঙ্গ আছে, সেটার জন্য তিনটি শব্দও কিন্তু সলজ্জে ব্যয়িত — অর্ধেক মানবী তুমি। তবু এখানেও পৌরুষেয়, দৃষ্টির তর-তম থাকতে পারে — স্রষ্টা পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি-পাতে যেটা 'আজি এরে দেখায় সুন্দর', সেখানেই অন্যতর পুরুষের অশিষ্ট লঙ্ঘন। স্থূল হস্তাবলেপ — অতএব নিরালার কবিকে অসহায় হয়ে লিখতে হয় —

আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারা তাদের সর্পিল পরিহাসে
তোমাকে দিলো রূপ —
কী ভয়াবহ নির্জন রূপ তোমাকে দিলো তারা;
তোমার সংস্পর্শের মানুষদের রক্তে দিলো মাছিব মতো কামনা

আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারাা তাদের বঙ্কিম পরিহাসে
আমাকে দিলো লিপি রচনা করবার আবেগ ঃ
যেন আমিও আগুন বাতাস জল,
যেন তোমাকেও সৃষ্টি করছি।

তোমার মুখের রূপ যেন রক্ত নয়, মাংস নয়, কামনা নয়,

নিশীথ-দেবদারু-দ্বীপ ঃ
কোনো দূর নির্জন নীলাভ দ্বীপ ;

স্থূল হাতে ব্যবহৃত হ'য়ে তবু
তুমি মাটির পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছো;
আমি হারিয়ে যাচ্ছি সুদূর দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়ার ভিতর।

অতএব এটাও কিন্তু এক বাস্তব যে, শুধুই মাছির মতো কামনা' নয়, পুরুষেরও সেই মোহদৃষ্টি আছে, যেখানে নারী-শরীর নান্দনিক অভিঘাতে মধুর হয়ে ওঠে। তাতে বিপরীত বাঞ্জনায় এক রমনীই কিন্তু পৌরুষেয় মুগ্ধতার পরম আশ্রয় এবং স্রষ্টা পুরুষের কল্যাণেই। এক রমনী কিন্তু আপন অবচেতনেই আপন শরীরের নান্দনিক প্রতিষ্ঠা খুঁজে পায়, সে কিন্তু তখন 'অবজেক্টিভিটি'র জায়গা থেকে সচেতন - ভাবে 'সাবজেক্টিভিটি'-র গর্বিত ক্ষেত্রে উত্তরিত হয়। সার্ত্রে তাঁর Reprieve বইখানাতে তাঁর মতো করে কথাটা বলেওছেন যাতে বোঝা যায় — স্রষ্টার অতিশয়িবী দৃষ্টি এক সময় দৃষ্ট ব্যক্তিত্বের 'সাবজেক্টিভিটি' তৈরী করে দেয়। Reprieve-এ Daniel এর সেই বিখ্যাত চিঠি — No one was there, you understand, Mathieu, no one at all. But the look was there. Understand me well: I did not see it, as one sees a passing profile, a forehead, or a pair of eyes; for its essential character is to be beyond perception.

সার্ত্রে কিন্তু কোনভাবেই এই প্রসঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টির কথা বলেননি। যদিও ১৯৭০ সালের সেই স্ত্রী-স্বাধীনতা-আন্দোলনে তরঙ্গ খানিক স্থিতি-লাভের পর, বিশেষত Mulvey-র সেই male-gaze-এর প্রতিপত্তির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যেন একটা সময় 'অবজেক্টিভিটি'-র জায়গা থেকে মেয়েদের উত্তরণের জায়গা তৈরী হয়েছে। 'সাবজেক্টিভিটি'-র মধ্যে। এমনকী, male gaze-এর জায়গায় female gaze নিয়েও অনেক কথা আরম্ভ হয়েছে। এটা অবশ্য মানতেই হবে যে ততদিনে women empowerment ব্যাপারটাও অভিজাত-ভাবনার মধ্যে নয় শুধু, সেটা বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বিদ্যস্থানগুলির মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার ফলে মেয়েদের আত্মসচেতনতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও - কোথাও অতিঃসচেতনতা এবং পুরুষ বিদ্বেষের অতিরেক তৈরী হয়েছিল। ফলে মেয়েরাই কিন্তু অদ্ভুত ভাবে এটা বুঝেছেন শেষ পর্যন্ত যে, কতিপয় পুরুষের সপ্রশংস তথা সকাম দৃষ্টিপাতই যেন এক সার্বিক পৌরুষেয় অবচেতন তৈরী করে দেয় মেয়েদের মধ্যে, যেখানে পুরুষের আকুল দৃষ্টিপাত শুধু 'অবজেক্টিফিকেশন'-এর প্রক্রিয়ার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, সেই যৌবন-সন্ধি থেকে ঘরে-বাইরে পুরুষের এই অকৃত্রিম দৃষ্টিপাতে অভ্যস্ত হতে-হতে সেটা কিন্তু অশেষ রমনীকুলের মনোবুদ্ধির মধ্যে অদ্ভুত এক সাহংকার অবচেতনও তৈরী করে। Margaret Atwood তাঁর আপন অভিজ্ঞতায় তাঁর লেখা উপন্যাস The Robber Bride উপন্যাসে লিখেছেন — সমস্ত যৌবনবতী রমনীর মনেও বুঝি এই পৌরুষেয় দৃষ্টিপাতের অপেক্ষা আছে —

Have you ever walked down the street, overanalysed every move you made and, thought about how the men walking by, would perceive you? Or been sat alone in a coffee shop wondering if you appear the right amount of mysterious that someone will find you intriguing? Or put on an outfit and wondered if it makes you look slutty,

almost like you'd be "asking for it"? Or feeling like absolute shit, completely run-down and hungover but still popping on a bit of makeup to nip to Tesco? Or been completely alone in your room, maybe even studying, but still feel the need to perform your femininity and look pretty? Knock, knock. That's the internalised male gaze at the door.

মহিলা উপন্যাসিকের এই বক্তব্যের নিরিখে আমরা যেন এটাও বুঝতে পারি যে, পুরুষের ওই দৃষ্টিপাতের মধ্যে যথা-কথঞ্চিৎ 'অবজেক্টিফিকেশন' থাকলেও — 'যথা-কথঞ্চিৎ' এই জন্যই বলছি যে, সব সময়েই নির্লজ্জ যৌনতার অভিসন্ধি-যুক্ত নাও হতে পারে — ফলত সেই দৃষ্টিপাত, হয়তো বা সেটা বহু পুরুষের সপ্রশংশ দৃষ্টিপাতও বটে, কিন্তু তাতে বোধ হয় মেয়েদের মনের মধ্যে এক ধরনের আত্মতৃপ্তিও তৈরী করে, যা গর্ব, অহংকার কিংবা মেয়েদের অতিরিক্ত আত্মসচেতনতাও তৈরী করতে পারে। আর যদি বা সেই গর্ব, অহংকার কিংবা আত্মসচেতনতার প্রায়-পাশ্চাত্য মানসিক পরিসর না হয়, তাহলে সেটা কিন্তু আত্মতৃপ্তির জায়গা তৈরী করে। সে বুঝতে পারে — বহু পুরুষের কাছেই সে কাম্য, তাকে অনেকেই একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। 'অবজেক্টিফিকেশন', 'কমোডিফিকেশন' — এই শব্দগুলি এসব ক্ষেত্রে অতি-সুপ্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের এই দৃষ্টিপাত এমনই এক চিরন্তন তথা প্রকৃতিক সত্য যে, সেটাকে আমরা 'অবজেক্টিফিকেশন', 'কমোডিফিকেশন' কিংবা এক 'unduly prying observer' অথবা 'voyeur'-এর মতো বিংশ-খ্রীষ্টাব্দীয় অকস্মাৎ সমাদৃত শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি না। বরঞ্চ এটা পুরুষের প্রথম দৃষ্টি-পর্বে রমনীর প্রতি যে রসশাস্ত্রীয় নিবেদন থাকে — নয়নপ্রীতির প্রথমম্ — সেটাই সব সময় আজকের দিনের পাশ্চাত্য উর্বরতায় objectification, commodification.

অস্বীকার করছি না, অভীষ্টা রমনীকে চোখে প্রথম দেখার মধ্যে পুরুষের দেহাভিনিবেশ থাকে — এমনকী যে-রমনীকে কোনও দিন সে আগে দেখেনি, তার প্রথম দর্শনে যদি পুরুষের অভিলাষ তৈরী হয়, সেখানে প্রথম কারণ অবশ্যই তার শরীর এবং এটাই পুরুষ-প্রকৃতি। আমাদের শাস্ত্রকারেরা অনেকেই আয়ুর্বেদের বদ্যিদের মতো সংস্কার জীবনের মনস্তত্ত্বে যে রোগগুলি তৈরী হয়, তার নিদান ধরার চেষ্টা করেছেন এবং এই চেষ্টায় তাঁরা সত্য বলতে গিয়ে তাঁরা যেমন একদিকে মেয়েদের object বলতে দ্বিধা করেননি, তেমনি অন্যদিকে পুরুষদের subjectivity দেখানোর সময় তাদের চির-মলিন অসহায় বাস্তবটারই উল্লেখ করেছেন। ফলে পুরুষেরও কোনও subjectivity থাকে না। সে নিতান্ত পরনির্ভর কে যন্ত্রমাত্র — এবং তা স্বয়ংক্রিয়ও নয়, নারীশরীর দর্শন-স্পর্শন-মাত্রেই তা প্রতিক্রিয় হয়। তার অন্তর্গত প্রবৃত্তিটাই এমন যে, সে নারীশরীরের স্মরণ-মনন ব্যতিরেকে নিষ্ক্রিয়, কিন্তু প্রবৃত্তির জাগরণ মাত্রেই যে শরীর খুঁজতে থাকে — নারী-শরীরের আয়োজন-প্রয়োজন সেখানে নিতান্তই এক সাড়ম্বর যান্ত্রিকতা মাত্র।

এমনকী শুধু 'ফিজিক্যাল' নয়, 'রোমানটিক' প্রেমের ক্ষেত্রেও যে কথাটা বাস্তব, সেটা ফরাসী দেশের এক মনীষী Andreas Capellanus দ্বাদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ De amore থেকে বোঝা যায়। ইংরেজি অনুবাদে আমরা John Jay Parry-র ১৯৪১ সে লেখা বইটি বেছে নিয়েছি এবং সেখানেও একজন পুরুষ-মাত্রেই নয়, বরঞ্চ তার অন্তর্গত সাংস্কারিক অসহায় প্রবৃত্তিকেই প্রধানত দায়ী করে Capellanus বলেছেন — "This inborn suffering comes, therefore, from seeing and

meditating".

বিশদ ব্যাখ্যা করে Capellanus লিখছেন —

That this suffering is inborn I shall show you clearly, because if you will look at the truth and distinguish carefully you will see that it does not arise out of any action, only from the reflection of the mind upon what it sees, does this suffering come. For when a man sees some woman fit for love and shaped according to his taste, he begins at once to lust after her in his heart; then the more he thinks about her the more he burns with love, until he comes to a fuller meditation. Presently he begins to think about the fashioning of the woman and to differentiate her limbs, to think about what she does, and to pry into the secrets of her body, and he desires to put each part of it to the fullest use. Then after he has come to this complete meditation, love cannot hold the reins.

উদ্ধৃতিটা বড়ো করেই দিলাম এইজন্য যে, আমি অন্য-দেশীয় সাধারণ মহাপুরুষরা কোন বিলক্ষন মনস্তত্ত্ব বহন করেন, সে বিষয়ে আমার বিশদ জ্ঞান নেই এবং প্রগতিবাদিনী রমনীরা অশেষ পুরুষকুলের কাছে যে-ধরনের লক্ষ্য-বিহীন উদাসীন দৃষ্টিপাত আশা করেন, সে ব্যাপারে ভারতবর্ষের রসশাস্ত্রও যেমন নাচার, তেমনই নাচার আমাদের দার্শনিকেরা। অবশ্য ফরাসী Capellanus-ও এই নাচার সত্য-বাস্তবের দলেই আছেন। এই যে আমাদের যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, যা Capellanus-এর সমসাময়িক ওই দ্বাদশ শতাব্দীতেই রচিত একখানা গ্রন্থ এবং সেটা একেবারেই দার্শনিক একখানি গ্রন্থ। দার্শনিক বিচারবুদ্ধিতেই স্বয়ং রামচন্দ্র তাঁর পরমশ্রদ্ধেয় কুলগুরু বশিষ্ঠকে পুরুষ-মানুষের জন্মজাত চিরমলিন দুর্বাসনার কথা উত্থাপন করছেন।

রামচন্দ্র বলছেন — একজন পুরুষের জন্ম এবং জীবনটা হল অনেকটা এঁদো পুকুরের মতো, যেখানে স্বল্প জলে মাছের মতো ঘুরে বেড়ায় তার মন। সেই মনও এমন, যেখানে তার দুর্বাসনা-রজ্জু ধরেই টেনে তুলে আনতে পারা যায় — কেননা, সেই মৎস্য-মনের কাছে এক রমনী হল বড়ষিতে বাঁধা মাংসপিণ্ডের মতো এক টোপ —

জনম-পল্বল-মৎস্যাবাং চিত্তকর্দমচারিণাম্।

পুংসাং দুর্বাসনারজ্জুর্নারী বড়িশ-পিন্ডিকা। ২১.২০, পৃঃ ৪৭ এক যৌবনবতী রমনী একজন জন্মকালীন দুর্বাসনায় ভোগা পুরুষের কাছে লোভনীয় মাংসপিণ্ডের টোপের মতো — এই কথাটা বলার মধ্যে এক রমনী প্রতি যে অমর্যাদা প্রকাশ পায় এবং objectification-এর চরম মাত্রা বলে মনে হতে পারে বটে, কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের এই দার্শনিক শ্লোকে পুরুষ-মানুষের মর্যাদা আরও অনেক নিম্নমানে চিহ্নিত — জন্মকালীন সময় থেকেই সে ঘোলা জলের মাছ। কামনা-দুর্বাসনা জন্ম থেকেই তার মনের মধ্যে এমনভাবেই প্রোথিত যে, মাছ যেমন মাংসের টোপ দেখা মাত্রই গিয়ে নেয়, তেমনি নারী-শরীর দর্শন-মাত্রেই প্রলুব্ধ হয় পুরুষ। এটা তার জন্মগত যন্ত্রণা — 'This suffering is inborn' — যেমনটা Capellanus বলেছেন। আর এই ভাবনাটা যদি অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাহলে আমার যৌবনসন্ধিতে পড়া Alberto Moravia-র Two Adolescents বইটা একটু পড়ে দেখবেন। বইটার প্রথমাংশ Agostino প্রথম অনূদিত হয়েছিল ১৯৪৭

(১৯৪৪) সালে। আর দ্বিতীয়াংশ যে সালে বেরিয়েছিল, সেই সালেই অনূদিত — Disobedience (১৯৫০)। আমি পেঙ্গুইনের বইটা পড়েছিলাম ১৯৬৭ সালে, যেখানে দুটি গল্পই একত্রে Two Adolescents নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমি এই বইটারই বিশেষ উল্লেখ করছি এইজন্য যে এই ইটালিয়ান ঔপন্যাসিকই বোধহয় প্রথম এই সার-সত্য উদ্ঘাটন করেন যে, নারী-শরীর মাত্রই কৈশোরগন্ধী এক বালকেরও অন্তর্গত যন্ত্রণার বিষয় এবং সেখানে মা-বোনের শরীরও একজন পুরুষের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে, হয়তো বা সেটা পরিশীলিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই to pry into the secrets of her body. কিন্তু এই কৌতূহল কোনও ভাবেই পূর্ণ যৌবনে তৎকাল-সমাগত কোনও আপাতিক তাড়না নয়, যাতে male gaze ব্যাপারটা এত আলোচ্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে। পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক Alberto Moravia-র ভাবনা-বৈচিত্র্য না হয়, ভারতবর্ষীয় মানুষের কাছে বিকার বলেই বিবেচিত হোক, কিন্তু এই মহান ভারতবর্ষে ভাগবত পুরাণের মতো গ্রন্থে কেন এই মনস্তাত্ত্বিক নিষেধাজ্ঞা জারি হল এই মর্মে যে, মা, বোন, নিজের মেয়ের সঙ্গেও যেন কখনও নির্জনে। কাছাকাছি একাসরে বসে থেকো না। কেননা পুরুষ-মানুষের ইন্দ্রিয়ের তাড়না এমনই যে সেগুলি অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান বিবেচক মানুষকেও বুদ্ধিভ্রষ্ট করে, তাকে আকর্ষণ করে রমনী-শরীর —

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা
নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয় -গ্রামো
বিদ্বাংসসপি, কর্ষতি।। ভাগবত পুরাণ, ৯.১৯.১৭

এই পৌরাণিক শ্লোকের তাৎপর্য শুনতে যতটাই অভব্য অথবা যতটাই শ্রবণ-কটু লাগুক, এই শ্লোকের মধ্যে ওই যে একটা শব্দ — 'ইন্দ্রিয়গ্রাসঃ' এটা কিন্তু একটা দার্শনিক শব্দ, যার সংজ্ঞা এবং বোঝাতে গেলে এখনই তিরিশ পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে হয়। তবু আমাদের প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্তত এই সারাৎসারটুকু বুঝে নেওয়া দরকার যে, আমাদের শাস্ত্র এবং দর্শনে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির অবস্থান কী, বিশেষত পুরুষদের ইন্দ্রিয়-বৃত্তির কথা আরও বেশী এখানে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, কেননা পূর্বোক্ত পৌরাণিক শ্লোকেও যেমন মা-বোনেদের ব্যাপারেই একজন পুরুষকে সাবধান করা হয়েছে, তেমনি আলবার্তো মোরাভিয়ার উপন্যাসেও যৌবনবতী এক মায়ের ব্যাপারেই একটি 'অ্যাডোলেসেন্ট' পুরুষের বিকার দেখানো হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, 'অবজেক্টিফিকেশন' ক্ষেত্রেও কিন্তু সেই male gaze -এর প্রশ্নটা নিয়েই যত চর্চা। অতএব পুরুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিয়েই আমাদের দার্শনিক অবস্থানটুকু সযৌক্তিক-ভাবে বুঝে নেওয়া উচিত।

কথাটা আমি দুই ভাবে উপস্থাপনা করতে চাই। প্রথমত আমরা বিখ্যাত পন্ডিত Henk Bodewitz একটি মূল্যবান ভাবনার কথা শোনাতে চাই। Bodywitz খুব কম বড়ো মানুষ নন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ — তিনি Ph.D করেছেন Utrecht-এ Jan Gonda-র মতো বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিতের কাছে এবং ওই Utrecht University-তেই এক সময় Gonda-র চেয়ারেই শেষে তিনি Professor of Sanskrit and Indo-European Scinghistics। যাই হোক Bodewitz জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লিখিত 'পাপ এবং

পাতক' নিয়ে একটি লেখাতে ছয় / সাত রকমের পাপকে বৈদিকরা কী চোখে দেখেছেন, তার বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে আগে আমি খ্রীষ্টপূর্ব অন্তত আটশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের মূলাংশ থেকে একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি —

স্বপ্নং তন্দ্রীং মন্যুম্ অশনয়াম্ অক্ষকাম্যাং স্ত্রীকাম্যাস্ ইতি।
এতে হ বৈ পাপ্সানঃ পুরুষম্ অস্মিন্ লোকে সচন্তে।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ যেসব পাপের কথা এখানে বলেছে, সেগুলি কিন্তু কোনও কৃতকর্মের ফল বলে মনে করে না এই গ্রন্থ; বরঞ্চ এই পাপগুলি সেগুলিকে 'পাপ্সা' বা বহুবচনে 'পাপ্সানঃ' বলে অভিহিত করা হচ্ছে, সেগুলি কিন্তু পুরুষ মানুষের প্রকৃতির অন্তর্গত দোষ বলে মনে করে এই বৈদিক গ্রন্থ এবং সেটা পুরুষেরই জন্মগত স্বভাবদোষ, মেয়েদের নয় কিন্তু। এবং সেটা উপরি-উক্ত দুটি পংক্তিতে উল্লিখিত স্ত্রী-বিষয়ক কামনা শুধু পুরুষের সঙ্গেই জড়িত হতে পারে — স্ত্রীকাম্যাং ... পুরুষং সচতে। আর এই স্ত্রীকামনার ব্যাপারটা যে শুধুমাত্র পুরুষের চক্ষুর বিষয়মাত্র নয়, সেটা যে একেবারে জন্মান্তরের মনোময় সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে যুক্ত, সেটা জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের আরম্ভেই উচ্চারিত হয়েছে — তদ্ যথা বৈ মনঃ উৎক্রামতি যদা প্রাণো যদা চক্ষুর্যদা শ্লোত্রং যদা বাগ্ এতান্ এব অগ্নীন্ অভিগচ্ছতি।

জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে পাপ বা 'পাপ্সা'-র জন্মান্তরীন অনুষঙ্গের ভাবনাটা তখনই সযৌক্তিক হয়ে ওঠে যখন দেখি গোপথ ব্রাহ্মণের মতো প্রাচীন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে পুরুষের অন্তরশায়ী কতগুলি বৃত্তিকে ইন্দ্রিয় বলে উল্লেখ করার সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলিকে জন্মগত বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে। গোপথ ব্রাহ্মণ বলছে — একজন ব্রাহ্মণ জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গেই একান্ত মনুষ্যোচিত-ভাবেই ইন্দ্রিয়-জনিত সাত ধরনের অনুরাগ জন্ম নেয়। এই সাতটি অনুরাগ হল — ব্রহ্মতেজ (এটাকে যে কোনও ব্রাহ্মণের Brahmanical ego বলে চিহ্নিত করা যায়), যশ, স্বপ্ন (নিদ্রা), ক্রোধ, আত্মশ্লঘা, রূপ (স্ত্রীলোকের রূপ) এবং সপ্তম হল পুণ্যগন্ধ (সম্ভবত স্ত্রীলোকের গন্ধ)—

জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণঃ সপ্তেন্দ্রিয়াণ্যভিজায়তে — ব্রহ্মবর্চসং চ যশচশ্চ স্বপ্নঞ্চ ক্রোধঞ্চ শ্লাঘাঞ্চ, রূপঞ্চ পুণ্যমেন গন্ধং সপ্তমম্।

এই যে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই এই সাত'রিপু'-র জন্ম হয়। এই ষড়-রিপুর জায়গায় সপ্ত রিপুকে কিন্তু 'ইন্দ্রিয়' বলে অভিহিত করছে গোপথ ব্রাহ্মণ এবং এই ইন্দ্রিয়গুলিও কিন্তু একজন পুরুষের বলেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। এবারে আমি Henk Bodewitz -এর কথায়। তিনি লিখছেন — গোপথ ব্রাহ্মণে ধৃত ব্রাহ্মণের জন্মজাত এই সপ্ত ইন্দ্রিয়গুলি আসলে আমাদের জন্মজাত ছয় রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ — বাকী দুটি, লোভ এবং মাৎসর্য এখানে বাদ আছে। তাঁর আপন ভাষায় —

The seven indriyani in GB 1, 2,2

The seven indriyani in GB1,2,2 are denoted with the term "passions" by Gonda (1965a,290) following Bloomfield (1899,111). They are:

1) brahmavarcasam, "the glory of a Brahmin," i.e. the object of his passion,

translated with "class-consciousness" and with "caste-pride" by the mentioned scholars and comparable with "pride" in the Western list;

2) yasas, "fame," the passion for which is likewise associated with

"pride";

3) svapna, "sleep," which as a passion looks like "sloth" in the seven cardinal sins;

4) krodha, "anger," not the object of a passion, but a cardinal sin;

5) slagha, "bragging,"an oral manifestation of "pride";

6) rupam, "beauty," perhaps the female beauty which attracts man as the object of his passion;

7) punyagandha, "fragrance (of women?)." If the items 6 and 7 would represent "lust" and 1, 2 and 3 "pride," only "covetousness," "gluttony" and "envy" are missing here.

Bodewitz এখানে যেমন কাম, ক্রোধ, দম্ভ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-বৃন্ত্রিকে পুরুষের জনমগত দোষ বলে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি খ্রিষ্টপূর্ব সাতশ বছর আগে লেখা জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ থেকে পাপ বা 'পাপ্সা'র উদাহরণ দিয়ে আরও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় এবং দার্শনিক পরম্পরায় মানুষের চক্ষু-কর্ন-জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলি মনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই কাজ করে বলে এগুলি জন্মগতভাবেই দোষ-গুণ বহন করে। পুনশ্চ তাঁর আপন কথায় —

2. The six papmanas in JB 1, 98 and 2,363

The six evilsof JB 1, 98 are given to man by the gods in order that he will become disqualified for heaven. They are called papmanas which is translated by Caland (1919.20) with diebosen Eigenschaften. "See also JB 2, 363.5 where these papmanas seem to be innate in man. This means that they should not be interpreted as evils overcoming human beings, but as natural qualities of man just like the indriyani occurring in the preceding section1, where they are powers or qualities of man, whereas here the evil nature of these powers is explicitly expressed. The combination of indriyāni and papmanas means evil powers in man's character.

These six items are: svapna and tandrī, "sleep"and"lassitude"or"

Lazi- ness" (cf."sloth" among the seven cardinal sins); manyu, "anger,"one of the cardinal sins; asanaya, "hunger" (cf."gluttony" among the cardinal sins); aksakamya, "passion for dice"; strikamya, "passion for women" (cf. the cardinal sin "lust"). Again four parallels of the seven cardinal sins are found here.

কাজেই মেয়েদের দিকে একবার / দু'বার তাকালেই - সুদৃষ্টিতে কিম্বা কুদৃষ্টিতে তাকালেই তাঁরা থানায় যেতে চান, তাঁরা ভাল লাগাও বোঝেন না, ভালবাসাও বোঝেন না, সমস্ত পার্থিব পুরুষই তাঁদের কাছে ধর্ষকের চেতনাধান করে। ফলত তাঁরা শরীর ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। চক্ষু, চক্ষুষ্মত্তা এবং দৃষ্টিপাতের

পিছনে যে গভীর মনস্তত্ত্ব আছে, তার দার্শনিক তাৎপর্যও তাঁদের জানা নেই, বিশেষত মানুষের মন যেখানে চক্ষু হয়ে ওঠে, সেই মনশ্চক্ষুর ধারনা তাঁদের ধারনশক্তির বাইরে। এর ওপরে যদি চোখের ভাষার কথা আসে, অথবা চোখ যদি সংগোপনে কথা বলে, সেখানে তাঁরা শুধুই গদ্যময় — কেননা ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী তো গদ্যময় বটেই, তাদের কীভাবে এক পুরুষ রমনীর আতীকল্পটুকু বোঝাই — গানটা মেহবুব কোতোয়ালের লেখা, ফিল্মি গান বটে, এমনকী বেশী তাকিয়ে ফেলার ফলে 'গুস্তাখি মাফ'ও চাইছে পুরুষ, কিন্তু সেই চোখের ভাষা পড়ে রমনীও এখানে চোখেই জবাব দেয় —

পুরুষ — হো আঁখোঁ-কী গুস্তাখিয়াঁ মাফ হো
এক তুক্ তুস্থেঁ দেখতী হ্যায়
জো বাত কহনা চাহে জুবাঁ
তুমসে ইয়ে উত বহতী হ্যায়।
হো আঁখোঁ-কী গুস্তাখিয়াঁ মাফ হো।

রমনী — আঁখোঁ কী শর্মা-ও-হয়া মাফ হো।
তুস্থেঁ দেখ-কে ছুপতী হ্যায়
উঠী আঁখেঁ জো বাত না কহ সকীঁ
রুকী আঁখেঁ উও কহতী হ্যায়

আমি এখানে এই দৃষ্টিপাতের বিষয়ে বড়ো বড়ো মানুষের লেখা আচ্ছা-আচ্ছা শায়েরী উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু চোদ্দ সেকেন্ডের প্রবক্তা মহিলারা সেসব বুঝবেন না — বুঝবেন না যে, 'আঁখ তো প্যায়-সে দিপ-কী জুবান হোতী হ্যায়'। পুনশ্চ এটাও তাঁদের বোঝানো মুশকিল যে, ইন্দ্রিয় হিসেবে চক্ষুরিন্দ্রিয় সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, চোখ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই প্রতিভূ হয়ে ওঠে। আদিত্য শ্চক্ষুর্মূক অক্ষিনী প্রাচিশৎ এতন্ড ভেবে দেখুন, চোখ শুধুমাত্র রূপই প্রত্যক্ষ করে না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুগুলিও চিনিয়ে দেয় চোখ। রসগোল্লা-সন্দেশ কিংবা ঢ্যারস-কাঁচকলার মধ্যে কোনটা আপনি খাবেন, সেটা কিন্তু চোখই ঠিক করে দেয়। কথায় বলে — অমুক খাবারটা দেখেই জিবে জল আসছে — তার মানে — রসনায় চরম তর্পণের কাজটা কিন্তু বিশেষ একটি খাবার 'দেখেই' হচ্ছে। অর্থাৎ রসনা-জিহ্বার বিষয় ঠিক করার ব্যাপারে চক্ষুরিন্দ্রয়ই প্রধান সহায়ক।

নাসিকা যে আঘ্রাণ করে, সেটাও চোখ দিয়ে ঘ্রাণ-গ্রাহ্য বস্তুর ভাল-মন্দ বিচার করে। একটা গোলাপ ফুল হাতে নেওয়া মাত্রই যে আমরা তার সুবাস আঘ্রাণ করার চেষ্টা করি, সেটা কিন্তু চোখ দিয়ে গোলাপ বুঝে নেবার পরেই। উল্টো দিকে কোথাও নোংরা দেখার পরেই কিন্তু আমরা নোংরার গন্ধ পরিহার করার জন্য দূরে ছিটকে যাই। তার মানে, নাসিকা-জিহ্বা যে বিষয় গ্রহণ করে, সেই বিষয়ের হেয়-উপাদেয়-ভাব-বর্জন করবো না গ্রহণ করবো সেটাও ঠিক করে দেয় চোখ। ত্বক-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে স্পর্শ, সেই স্পর্শ করার হেয়োপাদেয়তা তো চোখ ছাড়া সম্ভবই নয়। আগুন দেখার পরেই কিন্তু আমরা তার স্পর্শটুকু এড়িয়ে যাই। অপর দিকে প্রখর গ্রীষ্মে শীতল জল চোখ দিয়ে বুঝেই জল স্পর্শ করি। উনুনে যে জল গরম করছি, সেটা স্পর্শ করতে পারি

কিনা, জলের সেই উষ্ণতাও আমরা চোখ দিয়েই বিচার করি। এমনকী অপর মানব-শরীরের স্পর্শমুখ পেলব-সুকোমল, নাকি কঠিন, সেটাও চোখ দিয়েই বোঝা যায়।

চক্ষু যে কতখানি স্পর্শ-নির্ণায়ক এবং স্পর্শ বিধায়ক ইন্দ্রিয়, তা বোঝা যায় আমরা যখন একটি ছোট্ট মায়াবী শিশুকে দেখার পরেই তার গাল টিপে দিই। অথবা তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে দেখার পর মহারাজ দুষ্মন্ত প্রথমে ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই অগ্নিসমান তপস্বী কণ্ঠমুনির সন্তান হবেন, তারপরে যখন তিনি শুনলেন — শকুন্তলা বিশ্বামিত্র ঋষির ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত কন্যা, তখন তিনি বুঝলেন — শকুন্তলা ব্রাহ্মণ-কন্যা নন এবং তিনি ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্য এক রমনী। এই সম্পূর্ণ বুঝে নেওয়াটাকে দুষ্মন্ত্য বর্ণনা করছেন চক্ষু-সহায় ত্বগিন্দ্রিয়ের ভাষায়। দুষ্মন্ত্য বলছেন — আগে যে রমনীকে আগুন ভেবে ভয় পেয়েছি, তাকে এখন স্পর্শক্ষম রত্ন বলে মনে হচ্ছে — আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্।

আসলে ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শক্ষমতা অথবা কাকে স্পর্শ করা যায়, কিংবা যায় না, এটা শুধু চোখের ওপরে নয় কানের ওপরেও নির্ভর করে অনেকটা। ওই যে মনুর মহাজন-পদটি — রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর / প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। — এই পদে রূপ চক্ষুর বিষয়, আর গুণ কিন্তু কর্ণের বিষয়। এখানে জ্ঞানদাস একটু আগ বাড়িয়ে গুণ-ব্যাপারটাকে মনের জায়গায় নিয়ে গেছেন, এবং টো করেছেন দার্শনিক স্বভাবে, কেননা মন না চাইলে রূপও দেখি না, গুণের কথাও শুনি না। কিন্তু প্রতি অঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গ-স্পর্শের বাসনাটা চক্ষু দিয়ে রূপ দেখা এবং কান দিয়ে তার গুণকীর্ত্তন শোনার পরেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করেই সম্পন্ন হয়। মন সর্ব ইন্দ্রিয়েরই চালিকা শক্তি, তার কথা পরে হবে। আপাতত আলোচ্য বিষয় হল স্পর্শের ক্ষেত্রে চক্ষু কর্ণের ভূমিকা। একটা কাব্যিক উদাহরণ দিই।

ভাগবত পুরাণে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের মেয়ে বৈদর্ভী রুক্মিনী তখনও কৃষ্ণকে দেখেননি, শুধু তাঁর কথা শুনেছেন এবং সেটা শুনছেন অনেক দিন ধরে। তাঁর বাবা ভীষ্মক চেদিরাজ শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিনী বিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছেন এবং সেই বিয়ের দিন এগিয়ে আসছে। ঠিক এই অবস্থায় রুক্মিনী কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে একটা চিঠি লিখছেন এবং সে চিঠি বয়ে নিয়ে যাবেন এক ব্রাহ্মণ, গুপ্ত-ভাবে, কৃষ্ণের কাছে। রুক্মিনীর এই চিঠিটাকে আমরা প্রাচীন কালের প্রথম সার্থক প্রেমপত্র বলে মনে করি এবং তাঁর প্রথমারম্ভটা এইরকম —

তিন ভুবনের সেরা সুন্দর আমার। তোমার গুণের কথা যেমন শুনেছি, রূপের কথাও ততখানিই। সব শুনে আমার মন-প্রাণ সব জুড়িয়ে গেছে, জুড়িয়েছে শরীরে তাপ। আর সেই জন্যই আমার মনটিও দিন-দিন লজ্জাহীন হয়ে তোমার মধ্যেই আবিষ্ট হচ্ছে — শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে / নির্বিশ্য কর্ণ-মিবরং হরতো'অঙ্গতোপম্।

বুঝতেই পারা যায়, স্ত্রীলোক বলেই শরীরে কথা, বিশেত স্পর্শের আকাঙ্খা স্পষ্ট করে বলতে রুক্মিনীর একটা ঐতিহ্যগত কাব্যিক লজ্জা আছে, চোখের বিষয় কৃষ্ণের রূপ, আর কর্ণের বিষয় কৃষ্ণের 'কুল-শীল-রূপ-বিদ্যা-বয়স-অর্থধন এবং আবাসের গরিমা' — সব রুক্মিনীর মনের ওপর এসে পড়ল। ঠিক যেমনটা 'গুণে মন ভোর'। কিন্তু চক্ষু-কর্ণের মাধ্যমে রূপ-গুণের কথা শুনে গ্রহণযোগ্য স্পর্শের আকাঙ্খাটা অনেক চেপে রেখেও চাপা গেল। কেননা, একদিকে রূপ-গুণের কথা এমন করেই তাঁর মন জুড়ে বসেছে যে,

তাঁর শরীর-মনে লজ্জা বলে কিছু থাকছে না — রূপং দৃশাং দৃশিমতাম্ অখিলার্থ-লাভং / তয্যত্যুতাবিশতি চিত্তম্ অপত্রপং মে।

স্পর্শের ভাবনাটা লজ্জাহীনতা ছাড়া সঙ্গত হয় না বলেই আমি বলতে চাই — রুক্মিনীর কর্ণেন্দ্রিয়ই এখানে চক্ষুর কাজটাও যেমন করছে, তেমনই কান দিয়ে এই দেখার সঙ্গে সঙ্গে কান এখানে রুক্মিনীর ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পর্শসুখের নির্লজ্জতাও তৈরী করছে। তা নাহলে গায়ের জ্বালা জুড়োনোর সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে নির্লজ্জ হয়ে ওঠার প্রশ্ন ওঠে না। প্রধানত চোখে দেখা এবং খানিকটা কানে শোনার পরেই ত্বগিন্দ্রিয়ের স্পশ-ভাবনা তৈরী হয় এবং সেটাই যে হয়, তা খুব স্পষ্ট নঞর্থকতায় প্রকট হয়ে শেকসপিয়ারের একটি নাট্য-কবিতা Venus and Adonis -এ। Adonis -কে প্রলুব্ধ করার বার্তায় ভেনাস বলছে —

"Had I no eyes but ears, my ears would love That inward beauty and invisible; Or were I deaf, thy outward parts would move Each part in me that were but sensible: Though neither eyes nor ears, to hear nor see, Yet should I be in love by touching thee."

এর পরেও সম্ভবত আমার প্রতিপাদ্য বিষয়ে তর্ক তোলার মতো কিছু থাকে না। আমি বলতে চেয়েছি — পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চালিকা শক্তি হিসেবে চক্ষুর প্রাধান্য এবং চক্ষুর প্রাধান্য নিয়েও বুঝি প্রশ্ন থাকে না। তবে হ্যাঁ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ চিনে নেবার ব্যাপারে তর্ক তুলতে না পাারলেও কান বা শোনার ব্যাপারে চক্ষুর ভূমিকা নিয়ে দুটো কথা বলতেই পারেন। তবে আমরা বলবো — কানে শোনার ব্যাপারেও চোখের ভূমিকা আমরা অগ্রগণ্য বলে মনে করি। খুব সাধারণ ক্ষেত্রেও আপনি যদি কানে শুনে কোনও বিতর্কিত কিছু প্রমাণ করতে চান, তা হলে সেটা প্রমাণ বলে গণ্যই হয় না, যতক্ষণ না সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ন্যস্ত হচ্ছে। তার মানে, কানে শোনার বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে চোখে দেখার সাক্ষীটুকু একান্ত প্রয়োজন।

তাছাড়া লৌকিক ব্যবহারের মএধ্যেও একটা বেশ চালু কথা হল — উনি কান দিয়ে দেখেন। অর্থাৎ এমন মানুষ কিন্তু দুনিয়ায় অনেক আছেন যার নিজের কানে সরাসরি শুনে বস্তুবিচার করেন না। অন্যজনের সম্বন্ধে অন্যের কথা শুনে অনেক যে সিদ্ধান্ত নেন, অনেক সময়েই তার মধ্যে সত্য নিহিত থাকে না। ফলত সেই সিদ্ধান্তবশত যদি কোনও সমস্যা হয়, তখন তাকেই কিন্তু অপর পক্ষ প্রশ্ন করে — তুমি কি নিজের কানে শুনেছো ? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কিন্তু চক্ষুর ভূমিকা তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কেননা, নিজের কানে শোনা মানেই তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। আর প্রত্যক্ষ মানেই কানে শোনার ক্ষেত্রেও চক্ষুরই সহায়ক ভূমিকা আছে।

কান দিয়ে দেখার ব্যাপারে প্রাবাদিক প্রমাণ হলেন প্রাচীন কালের রাজারা। সংস্কৃতে একটা প্রবাদ আছে — রাজা কান দিয়ে দেখেন — রাজা কর্ণেন পশ্যতি। রাজা কীভাবে কান দিয়ে দেখেন তার উত্তরে পঞ্চতন্ত্র যে শ্লোকটি উল্লেখ করেছে, সেখান থেকে শুধু কান দিয়েই দেখা নয়, আর কোন কোন বস্তু বা ইন্দ্রিয় চক্ষুর কাজ করে দেয়, সেটাও বোঝা যায়। পঞ্চতন্ত্র বলছে — গরু গন্ধের দ্বারাা দেখে, বেদজ্ঞানের মাধ্যমে সব দেখতে পান ব্রাহ্মণেরা, গুপ্তচরদের চোখ দিয়ে রাজা তাঁর রাজ্যের সর্বত্র নজর রাখেন, একমাত্র সাধারণ লোকই যা দেখে, শুধু চোখ দিয়ে দেখে —

গাবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন বেদৈঃ পশ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ।

চারৈঃ পশ্যন্তি রাজানঃ চক্ষুভ্যামিতরে জনাঃ।।

কথাগুলি রূপকাকারে সর্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে চক্ষুর ভূমিকা প্রকট করে, বিশেষত রাজা যে বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের মাধ্যমে সব খবর কানে শুনে বস্তুবিচার করেন, সেখানে চরেরাই তাঁর চক্ষু হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ তাঁর কানে শোনাটা কিন্তু চরদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ কানই এখানে চোখের কাজ করছে — ক্রিয়াসু যুক্তৈ নৃপ চারচক্ষুষঃ — কথাটা বলেছিলেন ভারবি কবি। কেননা রাজার বিশেষনই হল তিনি চারচক্ষু।

প্রেমের ক্ষেত্রে অথবা ভালবাসার ক্ষেত্রেও কর্ণেন্দ্রিয় দিয়েই কতটা দেখাশোনা হয়, সেটা শেকসপিয়ারেই একটা লাইনেই প্রমাণ হয়ে যায় — কান আর চোখের উপাদান সেখানে একাকার — হ্যামলেটে যেমনটা — The very faculties of eyes and ears. আরও বিশেষ করে শুনুন সনেট নম্বর ২৩-এর বার্তা —

O, let my books be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love and look for recompense
More than that tongue that more hath more expressed.
O, learn to read what silent love hath writ;
To hear with eyes belongs to love's fine wit.

প্রেমের সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধি-কৌশল হল কান দিয়ে দেখা। এর পরেও কি কর্ণেন্দ্রিয়ের ওপর চক্ষুর সর্বাধিপত্য নিয়ে সংশয় থাকে কোনও !

আমাদের প্রস্তাবিত মনোবুদ্ধির বিচার এবং মহামতি বঙ্কিমচন্দ্রের কুমতি-সুমতির প্রস্তাবনা থেকে এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রূপের মতো বিষয় গ্রহণের ক্ষেত্রে চোখ ব্যাপারটা একটা কারণ মাত্র, যে-মুহূর্তে সে আপন স্বভাব বশে কোনও বস্তু বা ব্যক্তির ওপর দৃষ্টিপাত সেই মুহূর্ত থেকেই সে চালিত হতে থাকে মনের দ্বারা। এতটাই সে পরাধীন যে, মনের অঙ্গুলী-হেলনে মন যাকে দেখতে চাইছে, চক্ষু তার দিকে না চাইতেও পারে। এমনকী, মনোবুদ্ধির একান্ততায় প্রাণ-মন দিয়ে যাকে চাইছে, তার দিকেও সে লজ্জাবশত চোখে না চাইতেও পারে — প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, সরি একি তোর দুস্তরলজ্জা। তার মানে, চক্ষু-ব্যাপারটা নিতান্তই মনের কার্যসাধনের যন্ত্র-মাত্র। মানুষের স্বভাব, ধর্ম, চরিত্র যেখানে বুদ্ধির অধিকার, সেই বুদ্ধি মনের মধ্যে অধ্যস্ত হওয়ার, সেই মনোবুদ্ধি যেভাবে চোখকে চালায়, চোখও সেইভাবে চলে। অন্যথায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির কার্যসাধনের Tool-মাত্র, ঠিক যেমন একটা গাছ কাটতে গেলে কুঠার সেই ছেদন-ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠতম সাধন, তেমনই দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও চোখ আসলে মনোবুদ্ধির যান্ত্রিক সাধন-মাত্র। আর কিছু নয়।

তাহলে শুধু চোখ দিয়ে তাকানোর কথা বললে আমি সেই যান্ত্রিক দৃষ্টিপাতের মধ্যে দার্শনিক কোনও দোষ দেখতে পাইনা এবং সেক্ষেত্রে মেয়েদের দিকে চৌদ্দ সেকেন্ড অথবা ছত্রিশ সেকেন্ডের বেশী সময় তাকিয়ে থাকাটা আইনত অপরাধ — এই কথাটাকে আমি 'বাল-মূকাদিবৎ' মনে করি। বিশেষত মৈত্রায়নী উপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিষদ যখন চোখ-বস্তুটাকে সূর্যের সমান আখ্যা দেয় এবং বলে — পরম পুরুষের পূর্ণ অবস্থিতিই হচ্ছে চক্ষুর মধ্যে, কেননা তাঁর সেই বিশাল ব্যাপ্ত চক্ষুর ওপরেই নির্ভর করে আছে

সমস্ত বস্তুর, সমস্ত বিষয়ের গ্রহণ শক্তি — আদিত্যশ্চক্ষুঃ। চক্ষুরায়ত্তা হি পুরুষস্য মহতী মাত্রা। সত্যং বৈ চক্ষুঃ, অক্ষিণ্যবস্থিতো হি পুরুষঃ।

আসলে চক্ষুকে আদিত্য-সূর্যের সঙ্গে তুলনা করার কারণ হল — সকাল বেলায় সূর্য উঠলে যেমন অন্ধকার, ঢাকা এই পার্থিব জগৎ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই মর্ত্য মানুষের রাত্রির ঘুম, যা একটা সাময়িক মৃত্যুর মতো জ্ঞানহীন অন্ধকার, সেই ঘুম ভাঙায় কিন্তু চক্ষু এবং মানুষের সমানে সমস্ত জগৎকে প্রতিভাত করে তোলে। আমরা শুধু বলবো — এমন চৈতন্য-সম্পাদনের সহায়ক চক্ষুটাকে তো পৌরুষেয় আদেশ দেওয়া যায় না যে, তোমার সময় মাত্র চোদ্দ সেকেন্ড অথবা ছত্রিশ। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আর্তি জানিয়ে লিখেছেন — আঁখি যদি আজ করে অপরাধ করিয়ো ক্ষমা।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি ছায়াখানি পড়ে,
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার বরণডালা।

আমরা তাই প্রস্তাব করছি চোখকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। চোখ-বেচারার কাজই হচ্ছে তাকানো। কিন্তু তাকানোর পর স্রষ্টা মানুষটির মন তাকে কী চোখে দেখছে, সেইখানেই আপনার তিরস্কার-পুরস্কার, ঘৃণা-জুগুপ্সা অথবা ঔদাসীন্যের মানসিক বিচারটা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু সেখানেও তো বিশাল সমস্যা। আমরা তো কারও মনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারি না। তাকিয়ে-থাকা মানুষটি যদি অতি-সাধারণ, আমার মতো বুদ্ধিহীন এবং অতিশয় আবেগ-প্রবণ হন, তাহলে তাঁর আকার, ইঙ্গিত এবং চেষ্টা দেখে কোনও রমনী বুঝতেও বা পারবেন যে, সে-পুরুষ কী-চোখে দেখছেন তাঁকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে ভাব-গোপন-করা বড়ো মানুষের অভাব নেই কোনও, বিশেষত মেয়েরা তো এই ব্যাপারে সিদ্ধ মহাপুরুষ, নয়তো বা সার্থক রাজপুরুষের মতোই তাঁরা, যাঁরা ভাব গোপন করতে পারেন। তবুও — শরীর।

তবুও বাস্তব এটাই যে, আপনি যে দেশেই থাকুন অথবা যে ভাষাই বলুন, মানুষের শরীরই হল তার মাতৃভাষা। শাব্দিক ভাষায় যা বলা যায় না, শরীরের বিচিত্র অভিব্যক্তি, সঙ্কেত, এমনকী শরীরের অনভিব্যক্ত ভাবও কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত এক নতুন ভাষা তৈরী করে এবং সেটাই আমাদের অর্ন্তগূঢ় প্রেম, ভালবাসা, এমনকী যৌনতারও মাতৃভাষা। মানুষের বেশ-বাস, সাজ-সজ্জা, অলঙ্করণও কিন্তু এই শারীরী মাতৃভাষার বিশেষ্য-বিশেষণ। এইসব কিছুই নারী-পুরুষের একের প্রতি অপরের প্রযোজ্য বিভিন্ন ক্রিয়াপদ তৈরী করে, যেটা প্রযোজক নারী-পুরুষ নিজেরাও তেমন করে বোঝে না, সেটা বোঝেন শুধু কবি

স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে

প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো।

শৃঙ্গার বা eroticism-এর জগৎটাই এমন, যেখানে কাব্য এবং রসশাস্ত্রের জগৎ বড়ো বেশী করে মুখর হয়ে ওঠে। এখানে এক সুন্দরী রমনীর প্রতি রমনীয় দৃষ্টিপাত পণ্যতার আশাঙ্কায় অতি-সচেতন এবং ততোধিক ব্যগ্রভাবে কুচিন্তিতও হয় না, কুব্যাঘ্যাত তো নয়ই। ওই যে যাঁরা my body স্বেচ্ছামানসিনী, স্বেচ্ছাশরীরিনী এবং স্বেচ্ছাবাগ্‌বিলাসিনী, তাঁরা Andrew Traver-এর বিখ্যাত প্রবন্ধ The Nazi Eye Code of falling in love : Bright Eyes, Black Heart, Crazed Gaze পড়ে নিয়ে তৃপ্তি লাভ করুন, কিন্তু আমাদের শৃঙ্গার জগতে পুরুষের প্রথম আলোকিত দৃষ্টিপাত অবধারিত ভাবে এক সুন্দরী রমনীর আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা জাগ্রত করে অথবা 'অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে'।

লিও টলস্টয়-এর নায়িকা আনা করে নিন স্বামীর সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছিলেন — এই অবস্থায় Vronsky-র আলোকিত দৃষ্টিপাত Anna-র প্রতি এবং Het shining grey eyes, that looked dark from the thick lashes, rested with friendly attention on his face, as though she were recognising him, and then promptly turned away to the passing crowd, as though seeking some one. In that brief look Vronsky had time to notice the suppressed eagerness which played over her face, and flitted between the brilliant eyes and the faint smile that curved her red lips. It was as though her nature were so brimming over with something that against her will it showed itself now in the flash of her eyes, and now in her smile. Deliberately she shrouded the light in her eyes, but it shone against her will in the faintly perceptible smile.

আমার দোষ হচ্ছে , আমি দেহাত্মবাদিনী রমনীদের কথায় বিরক্ত হয়ে তাঁদের কথার জবাব দিচ্ছি এতক্ষণ ধরে। বিশেষত, দৃষ্টিপাত-মাত্রেই যাঁরা যৌনতা বোঝেন, তাঁদের enotics বোঝানো যতখানি সহজ, eroticiasm বোঝানো ততটাই কঠিন। ইরোটিসিজম-এর ক্ষেত্রে সমুদ্দিষ্ট নারী-পুরুষের দৃষ্টি মাত্র নয়, এমনকী তাঁদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সেখানে গৌন বিষয়, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে সমস্ত সামগ্রী, বেশ-বাস, শয্যা-গন্ধ, চরণের নূপুর, এমনকী একটা রুমালও সেখানে শৃঙ্গার-মদির ভাব তৈরী করে — আমাদের আজন্ম-সহবাসিনী প্রকৃতিও এখানে বাদ থাকে না — সে না হলে আমার শৃঙ্গারী কবির মোহন বাঁশী বাজেই না। এ বাবদে আমাদের পাশ্চাত্যের গরিমা-লুব্ধ মুগ্ধ পাঠকেরা জ্ঞানদাসের পদ শুনে বলতেই পারেন — ওসব ভাবের কবিতা আমাদের সয় না, কিন্তু এটা ওঁরা বোঝেন না যে, শৃঙ্গারী কবির জগতে নর-নারীর উন্মুখ বাস্তবের মধ্যে জল, হাওয়া, বৃক্ষ-লতা, বর্ষা-বসন্ত সবটাই ecopoctics হয়ে ওঠে। আজকাল ওদেশের ভাবুকেরা ঐই বিষয়টাকে ecopoctics বলে একটা deviant horm তৈরী করেছেন, আমরা খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীতে এর নাম দিয়েছি উদ্দীপন বিভাব, যেটা রমনিস্পত্তির অন্যতম কারিগর।

আসলে সত্যিই তো এসব ভাবের কথা, আর ভাবের কথার মধ্যে নাৎস্যায়নের নাগরিক বৃত্তি যেমন থাকে, তেমনি থাকে গ্রাম্যতা, আর যাহা আছে, তাহা কহিবার নয়, সখি —

পুষ্করিণীর চাইর পারে যে ফুটল চাম্‌পা ফুল।
ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু ঝাইড়া বান্‌তাম চুল।।

দুষমণ পাড়ার লোক দুষমণি করিবে।
এমন কালে দেখনে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে।।

হস্ত ছাড় পরাণেব বন্ধু চাইলা যাইতাম ঘরে।
কি জানি কক্ষের কলসী ভাসাইয়া নেয় সুতে।।
দূরে বাজে মনের বাঁশী ঐ না কলা বনে।
তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি নিশা কালে।।

এই হল শৃঙ্গারী কবির জগৎ। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে লিখেছেন — যে মহান কবির মধ্যে কবিত্বের পূর্ণ পরিপাক ঘটেছে, তাঁরা এমন কবিতা লিখতেই পারেন না, যেখানে রস-ভাবের তাৎপর্য নেই। আর রস-ভাবের তাৎপর্যের বোধ যদি কবির মধ্যে থাকে, তাহলে এমন কোনও বিষয় নেই, যা কবির শব্দমন্ত্রের অভিযাতে দ্বিগুন আস্বাদন তৈরী না করে ক্ষান্ত হয় না। আনন্দবর্ধন লিখছেন — রসাস্বাদনের এই বিশদ আস্বাদন তৈরী করতে হলে eroticism -এর বোধ কবির অন্তরশায়ী হাওয়া দরকার।

কবি যদি শৃঙ্গারী হয়ে ওঠেন, তাহলে সম্পূর্ণ জগৎ তাঁর কাছে রসময় হয়ে ওঠে — শৃঙ্গারী চেৎ কবি কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ। কিন্তু কবি যদি ‘বীতরাগ’, কামনা-বাসনার স্পর্শহীন, মোহহীন, বিরাগী হয়ে পড়েন, তাহলে সম্পূর্ণ জগৎই নীরস হয়ে ওঠে — স এই বীতরাগ - শ্চেন্‌ নীরসং সর্বসেন তৎ।

কাজেই কবিতার মধ্যে শৃঙ্গারী কবির ‘রসৈকতাৎপর্যময়’ ভাবটাই সব এবং এই শৃঙ্গার-শব্দটা একটু বিশদ অর্থে গ্রহণ করলে eroticism -এর বিশাল তাৎপর্যটাও সেখানে সমঞ্জস্য হয়ে ওঠে বলেই আনন্দবর্ধন লিখেছেন — কবি সানুরাগে শৃঙ্গারী হয়ে উঠলে, তিনি অচেতন বস্তুর মধ্যেও চেতনার সঞ্চার ঘটাতে পারেন, আবার চেতন বস্তুর মধ্যেও অচেতনের ব্যবহার আরোপ করতে পারেন। আমরা আরো পরিষ্কার করে বলি — শৃঙ্গারী কবি আকাশ-বাতাস থেকে আরম্ভ করে নদী-পর্বত সমস্ত বস্তুকে কীভাবে শৃঙ্গারী করে ভুলতে পারেন, তার প্রতিছত্র প্রমাণ আছে কালিদাসের মেঘদূতে। আর না হয় উদাহরণ দিই একটা T. S. Eliot থেকে, না হয় রবীন্দ্রনাথ থেকে —

She is alone
With all the old nocturnal smells
That cross and cross across her brain.
The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices,

Smells of chestnuts in the streets,
And female smells in shuttered rooms,
And cigarettes in corridors
And cocktail smells in bars.

আর রবীন্দ্রনাথের এক রমনীর প্রাকৃতিক শিঙার — সে অচ্ছোদ-সরোবরের ‘মিথিক্যাল’ জলে স্নান সেরে উঠেছে সদ্য — ‘মিথিক্যাল’ জল বলছি এই কারণে যে, কাশ্মীরে অনন্তনাগ থেকে পনেরো মাইল দূরে এই ঐতিহাসিক সরোবর এবং একটি পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী পাঁচ গন্ধর্বকন্যা কুবেরের রাজপ্রাসাদে বিবিধ ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটাত। একদিন তারা ভগবতী গৌরীর পূজার জন্য ফুল তুলতে আসে অচ্ছোদ সরোবরে। সেখান থেকে স্বর্ণপদ্ম তুলে গন্ধর্ব কন্যারা নৃত্যগীতে মত্ত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময়ে মহর্ষি বেদনিধির জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করতে আসেন। কন্যারা হাব-ভাব লাস্যে মুনিকে ভুলিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে চাইল। বেদনিধির পুত্র বললেন যে, তিনি ব্রহ্মচারী, গুরুকুলে শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিবাহ করতে পারবেন না। গন্ধর্বকন্যারা তাঁর কথায় কান না দিয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা চালিয়েই গেল। এতে ক্রোধান্বিত মুনি তাদের পিশাচী হবার অভিশাপ দিলেন। প্রত্যুত্তরে গন্ধর্বকন্যারাও বেদনিধির পুত্রকে পিশাচ হবার অভিশাপ দিল। এরা সকলেই অচ্ছোদ সরোবরের তীরে পিশাচ-পিশাচী হয়ে রইলেন।

এই পিশাচ-পিশাচীকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করাই ভাল, কেননা কামনায় বিদ্ধ গন্ধর্ব-কন্যাদের কাম-পিশাচী বলতেও বাধা নেই কোনও, কিন্তু এইসব নামকরণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এটাই যে, এই অচ্ছোদ-সরোবরের জলে শৃঙ্গারের গন্ধ মিশে আছে, মিশে আছে eroticism, যেটাকে প্রগুনিত বর্ণনায় প্রকট করে তুলেছেন হর্ষবর্ধনের রাজসভার কবি কাদম্বরী-রসজ্ঞ বাণভট্ট। রবীন্দ্রনাথের নাম-সূত্র কিন্তু এইখানেই ‘অচ্ছোদ সরসীনীরে রমনী সেদিন নামিল স্নানের তরে’। আমার উদ্ধৃত অংশে রমনী স্নান সেরে উঠেছেন —

তীরে উঠিলা রূপসী —
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র — ললাটে অধরে
ঊরু - পরে রুটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে স্যাত
সর্বাঙ্গে চুম্বিল তার, সেবকের মতো

সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে — ছায়াখানি রক্তপদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।

জানি না, এমন বাসে, এমন বেশে এই সিক্তবসনা রমনীকে দেখেও কী কোনও মানে হয় — এই আর্যেতর বাসে পরস্পর অস্পৃষ্ট থাকার ? ভাগ্যিস এখানে আকাশ আর বাতাসই একত্রে সন্নত সর্বাঙ্গে চুম্বিল তার। ভাগ্যিস এটা সহকবির জবানীতে মানুষের শৃঙ্গার — যেখানে মদন দগ্ধ না হয়ে মোহিত হবে নিজেই। প্রশ্ন আসে, শৃঙ্গারের এই বিচিত্র মিশালে যে রমনী কবির নামকরণে 'বিজয়িনী', তার দিকে কী চোখে তাকাবো, সখী ! কতক্ষনই বা ! ম্যায়নে দেখা হ্যায় বহত্, ফিরভী বহত্ কম দেখা।

ভালো চুলের গোড়ার কথা

— ডঃ কৌশিক লাহিড়ী
বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ

তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর 'পরে রাগ কর?'... অন্নদাশঙ্করের সেই বিখ্যাত ছড়াটার 'ভাঙলো' শব্দটা বদলে অনায়াসে 'কিনলো' করে দেওয়া যায় সুরেশের ক্ষেত্রে। সত্যি, কিছু তেলের শিশি কিনতেও পারে বটে ছেলেটা। লম্বা, বেঁটে, চ্যাপ্টা, গোল-কত রকমের যে চুলের তেলের শিশি ওরসংগ্রহে আছে, কে জানে! তার কিছু কাচের, বেশ কিছু আবার প্লাস্টিকের। কী তাদের বাহার, আর কত রকমের গন্ধ! বিদিশা অনায়াসে একটা তেলের শিশির মিউজিয়াম খুলতে পারে।

কিন্তু এত করেও ওর খুশকি সারে না। এত তেল, এত যত্ন, তা-ও খুশকি কমে না! চুলও বাড়ে না। ওকে কে বলে দেবে, কোনো তেল মেখেই খুশকি সারবে না, চুলও বাড়বে না এক মিলিমিটার। অবাক হলেন? এমন কেউ আছেন নাকি এই গ্রহে, যিনি কোনোদিন চুলের সমস্যায় ভোগেননি? চুলের সংখ্যার মতো চুলের সমস্যাও বোধহয় অজস্র, অগুনতি। সংখ্যার কথা যখন এলই, তখন বলেই ফেলি, একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের মাথায় ক'টা চুল থাকে। মোটামুটি লাখখানেক। ওই ইডেনে যত লোক ধরে, প্রায় সেইরকম। আর খেলা বলুন, ঝামেলা বলুন, শুরুটা সেখানেই। আসুন একটু জেনে নেওয়া যাক।

নৃতত্ত্ব

ধর্ম আর রাজনীতি মানুষকে যত ভাগেই ভাগ করুক, মানুষের কিন্তু নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে মোটামুটি তিনটি ভাগ—নিগ্রয়েড, মোঙ্গলয়েড আর ককেশয়েড। কবিরা সত্যদ্রষ্টা। 'মহামানবের সাগর তীরে' ভারতবর্ষে আর্য-অনার্য, শক, হুন দল, পাঠান-মোগল সত্যিই একদেহে লীন হয়ে আছে। তাই এ দেশে সব ধরনের নৃতাত্ত্বিক লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায়। কালো মানুষ, মঙ্গোলীয় এমনকী ককেশীয়দেরও চুলের রঙ কিন্তু প্রধানত কালো। উত্তর ইউরোপীয়দের চুল সোনালি, আবার স্কটিশদের চুল লাল। যদি ক্রস সেকশন কাটা যায়, দেখা যাবে চীনা-জাপানিদের চুল

নিটোল গোল, আমাদের ঈষৎ উপবৃত্তাকার আর কালো মানুষদের একেবারে চ্যাপ্টা লম্বাটে। এই কারণেই ওদের চুল কোঁকড়ানো আর মোঙ্গলীয়দের সিধে। আমাদের, ওই যে বলেছি, দু'রকমেরই হতে পারে। মজার

কথা হল, নৃতাত্ত্বিকরা চুলের গঠনের ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতিকে দুটি মাত্র বিভাগে ভাগ করেছেন, লিওট্রিচি মানে যাদের সোজা চুল আর উল্টোট্রিচি অর্থাৎ যাদের কোঁকড়া চুল।

চুলচক্র

দশচক্রে ভগবান ভূত হতে পারেন, তবে চুলের ভূত হয়ে যেতে, মানে উধাও হয়ে যেতে লাগে মাত্রই তিনটি দশা। অ্যানাজেন বা সক্রিয় দশা। মাথার নব্বই শতাংশ চুলই এই গোত্রের। দুই থেকে দশ বছর সক্রিয় থাকার পর চুল চলে যায় ক্যাটাজেন বা মিশ্র দশায়। থাকে কমবেশি দু-তিন সপ্তাহ। তারপর নিষ্ক্রিয় বা টেলোজেন দশা। একটু একটু করে খসে যাওয়ার সময় এটা। মাস তিনেক এর আয়ু। মাথার এক শতাংশ চুল এই গোত্রের। অর্থাৎ, এক লক্ষে একশোটি। সাদা কথায় মানেটা দাঁড়াল, রোজ মাথা থেকে শ'খানেক চুল ঝরে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

বাড়বৃদ্ধি

মজার কথাটা হল, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুলের সংখ্যা কমে এলেও বৃদ্ধির হার তো কমে না-ই, বরং বাড়ে। বয়স যখন ষাটের কোঠায়, কি সত্তরের ওপারে, চুলের বাড় তখনই সর্বাধিক। বৃদ্ধির হিসেবে মেয়েরা এগিয়ে মাথার চুলে। অন্যত্র ছেলেরা। হাত-পায়ের চুলের থেকে দ্রুত বাড়ে গোঁফ। আবার গোঁফের থেকে ঈষৎ দ্রুত বাড়ে দাড়ি। তবে আরও দ্রুত বাড়ে মাথার চুল। বিশেষত, গরমকালে। একটা কথা, যতই কমানো হোক (শিব্রামের কথায়ঃ Come-আও বলে হাঁকডাক করা হোক) চুলের ঘনত্ব বা বৃদ্ধিতে তার কোনো ভূমিকাই নেই। অর্থাৎ, রোজ দাড়ি কামালে দাড়ি কড়া হয় না, আর ন্যাড়া হয়েও লাভ নেই। চুলের বাড়-বৃদ্ধির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই সেখানে।

চুলের চলে যাওয়া

নিউ জার্সির ওয়াশিংটন বুলেভার্ড থেকে আমার সদ্য যুবক এবং অতি মেধাবী মাসতুতো ভাইয়ের ই-মেল ভেসে এল কম্পিউটারের পর্দায় '... পড়তে পড়তে মাথার চুলগুলো যে সব উঠে গেল!' তাকে উত্তরে লিখলাম, 'ওপরওয়ালা মাত্র কয়েকটি নিখুঁত মাথা সৃষ্টি করেছিলেন। আর বাকি খুঁতওয়ালাগুলো চুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। তোমার মাথাটা যেহেতু নিখুঁত তাই চুলের আবরণ অপ্রয়োজনীয়।' খুব চেনা রসিকতা। ভাইও কম যায় না। উত্তর দিল চমৎকার-'মাথার ভেতরে কী আছে, সেটাই কথা। মাথার ওপরে কী থাকল না-থাকল, সেটা কোনো ব্যাপারই নয়।' মাথার দুঃখ মনে চেপে রেখে দুরন্ত রসিকতা।

অমোঘ এই ব্যাপারটি নিয়ে যুগে যুগে রসিকতা করা ছাড়া আর কীই-বা করার আছে মানুষের। স্বর্ণযুগের বাংলা সিনেমার নামেও নামাঙ্কিত হয়েছে টাক পড়ার বিভিন্ন দশা। একেবারে প্রথমে 'তিন ভুবনের পারে'। সবই কপাল। তার পরের ধাপ, 'ওরা থাকে ওপারে।' আরও পিছিয়ে যাচ্ছে কেশরেখা। তারপর 'স্মৃতিটুকু থাক', মানে প্রফেসর শঙ্কু অথবা জটায়ু লালমোহনবাবুর মতো মাথার অবস্থা। আর সব শেষে, 'মরুতীর্থ'। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কমতে থাকা চুলের ফাঁকে, মাঝ বয়সের সংস্কৃতি....

শুরুটা কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যেই। প্যাটার্নটাই হল, প্রথমে মাথার সামনের দু'পাশের চুল পাতলা হতে থাকে। অনেকটা ইংরেজির 'এম' আকৃতির। তারপর মাথার পেছনের অংশের পালা। বেশ কিছু পর্যায় (হ্যামিল্টন চিহ্নিত করেছেন সাতটি পর্যায়) পেরিয়ে ফাঁকা অংশগুলি জুড়তে থাকে। তারপর শুধু দিন গোনা আর নিজের অল্প বয়সের ছবির দিকে চেয়ে বুক খালি-করা দীর্ঘশ্বাস, 'আমার যে দিন ভেসে গেছে' (এখানে 'দিনের' জায়গায় 'চুল' আর 'ভেসে'র জায়গায় 'উঠে' লাগিয়ে গাইতে হবে।) চিকিৎসা যে নেই, তা নয়। মিনক্সিডিল নামে একটি ওষুধ বিভিন্ন মাত্রায় সঠিকভাবে ব্যবহার করে যেতে হবে। খেতে হতে পারে ফিনাস্টেরাইড। আর সব শেষে করা যেতে পারে সার্জারি। হেয়ার গ্রাফটিং। তবে এই পদ্ধতিতে 'শাপমোচন' কিন্তু বেশ খরচ সাপেক্ষ।

পর্ণমোচী

এ ছাড়াও চুল উঠে যেতে পারে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া জাতীয় প্রলম্বিত জ্বরের পর। অথবা টিবি-র মতো কোনো বড় অসুখে। দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার, এমনকী অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকেও পাতলা হয়ে যেতে পারে চুল। 'ক্র্যাশ ডায়েট' করে তন্বী হতে গিয়েও চুলের সর্বনাশ করেন বহু কিশোর-তরুণ। এছাড়া থাইরয়েড বা কিডনির সমস্যায় আর আমাদের দেশে যেটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, রক্তাল্পতার কারণে চুল উঠে যেতে পারে। উঠে যায় ক্যানসারের ওষুধ থেকেও। এই ধরনের চুল পড়াকে বলে টেলোজেন ইফ্লুভিয়াম। অর্থাৎ, কেশ-মূল বা হেয়ার ফলিকলগুলি হঠাৎই নিষ্ক্রিয় বা টেলোজেন দশায় পৌঁছতে শুরু করে। যার পরিণতি চুল ঝরে যাওয়া, শীতের শুরুতে পর্ণমোচী গাছের পাতার মতো।

টাকপোকা, পোকা নয়

কখনও কখনও কোনো অংশে চকচকে গোল হয়ে চুল উঠে যায়। এর ডাক্তারি নাম অ্যালোপ্যাশিয়া এরিয়েটা। বাংলায় বলে টাকপোকা। পরিষ্কার করেই বলা ভালো কোনোরকমের কোনো পোকার সঙ্গেই কিন্তু এর কোনো সম্পর্ক নেই। বেশিরভাগ সময় নিজে থেকেই সেরে যায়। ছোটবেলায় শুরু হলে বা কানের ও মাথার পেছন থেকে চুল উঠে গিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে টাক পড়তে থাকলে বুঝতে হবে লক্ষণ ভালো নয়। এই লক্ষণটির নাম ওফিয়াসিস। ছেলেদের মধ্যেও অনেক সময় নিজের চুল নিজেই ছেঁড়ার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এর উৎস কিন্তু ত্বকে নয়, মানসিক দ্বন্দ্বে। রোগটির নাম 'ট্রাইকোটিলোম্যানিয়া'। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এক্ষেত্রে সুরাহা করতে পারে।

সাদা চুল

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রুপোলি চুলের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রকৃতির এক স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কারও যদি বয়স কুড়ির কোঠায় পৌঁছনোর আগেই চুল পাকতে শুরু করে? সেটা অসুখ। সঠিক কারণ অজানা। তবে হাইপার থাইরয়েডিজম থাকতে পারে, হতে পারে বংশগতও।

খুশকি কী ও কেন

খুশকি হল একটি প্রদাহহীন এবং 'স্কেল' বা খোসা উৎপাদক অবস্থা, যা প্রধানত মাথায় দেখা যায়। আর প্রদাহমূলক সেবরিক ডার্মাটাইটিস ব্যাপারটা ঈষৎ আলাদা। স্বাভাবিক মাথা থেকে রোজ লাখ চারেক মৃত দেহকোষ বের হয়, খুশকি হলে সেটাই বেড়ে দাঁড়ায় আট লাখের মতো। শুরু হয় খোসা ওঠা। সঙ্গে যদি যোগ হয় ছত্রাক সংক্রমণ, সমস্যা বেড়ে যায়। চিকিৎসা হল মাথা পরিষ্কার রাখা। দরকার হলে রোজ শ্যাম্পু। তার মধ্যে সপ্তাহে অন্তত দু'বার কিটোকোনাজোল ও জিঙ্ক ফাইরিথিয়াম দেওয়া শ্যাম্পু করলে ভালো হয়।

তেলা মাথায় তেল

সুরেশের কথায় ফিরি। শুধু সুরেশ নয়, অনেকেরই এই অভ্যেসটি আজও আছে। নির্জলা বৈজ্ঞানিক সত্যি কথাটা হল কন্ডিশনিং এফেক্ট ছাড়া আর কোনো কাজ নেই তেলের। বরং , অকাজ আছে। ধুলো-ময়লা আটকে বাড়াতে পারে সমস্যা। তা ছাড়া প্রতিটি চুলের গোড়ায় আছে তৈলগ্রন্থি। প্রতিনিয়ত তেল নিঃসৃত হচ্ছে সেগুলি থেকে। তার ওপর তেল দেওয়া সত্যিকারের 'তেলা মাথায় তেল' হয়েই দাঁড়ায়। আর তেল না দিলে চুল রুক্ষও হয় না, লালও হয় না, সে-সবের মূল কারণ সাধারণ অপুষ্টি।

শেষের সাতকাহন

- পেটের রোগ, লিভারের অসুখ, ভাজা খাওয়ার সঙ্গে চুলের অকাল পক্কতার কোনো সম্পর্ক নেই।
- তেল না মাখলে মাথাধরা, চুল পড়া বা পাকা কোনোটাই হয় না।
- রোজ ৬০-১০০টি চুল ঝরে যাওয়া স্বাভাবিক।
- ন্যাড়া হয়ে চুলের কোনো লাভ হয় না।
- রোজ দাড়ি কাটলে দাড়ি কড়া বা ঘন, কোনোটাই হয় না।
- নিয়মিত শ্যাম্পু জরুরি। বিশেষত শহরে। দরকার রোজ।
- মাথায় তেল মাখার সঙ্গে চুলের স্বাস্থ্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

শুকদেব ও তার শব্দ

— বিনোদ ঘোষাল

শুকদেব দোকানে হাঁ করে বসেছিল। বাইরে মেন রাস্তায় সাইকেল, রিক্সা, বাইক, গাড়ির হাজার রকমের শব্দ, এসব কিছুই তার কানে ঢুকছিল না। তার কান জুড়ে, মন জুড়ে শুধু ওই পুরনো সেলাই মেশিনটার মতোই ঘরঘর করে বেজে চলছিল একটু আগে বলে যাওয়া রাজুর কথাগুলো।

দেখো, শুকদেবদা, দুনিয়া পালটে গিয়েছে, তুমিও না পাল্টালে এবার সত্যি সত্যি মরবে। নিজে একা নয়, বউ ছেলে নিয়ে মরবে। তোমার মাথাটা কী দিয়ে তৈরি বলো তো? ইঁট নাকি নিরেট সিমেন্ট? নিজে চোখে দেখতে পাও না? এলাকায় আর একটাও দরজির দোকান তুমি দেখতে পাও? পাও না তো? আরে এটা শুধু আমাদের চঞ্চলনগরেই নয়, কলকাতায় গেলেও তুমি আর দর্জির দোকান দেখতে পাবে না। ওই জমানা শেষ, এখন রেডিমেডের যুগ এসে গিয়েছে দাদা। আরে ছোটবেলায় আমিও মা-বাবার সঙ্গে সে তোমার এই টেবিলের ওপর বসে জামা প্যান্টের মাপ দিয়েছি, কিন্তু সেসব বিশ পঁচিশ বছর আগের কথা, এখন কেউ জামা প্যান্ট বানিয়ে পরে না দাদা, সেটা তুমিও জানো। বেশ ভাল করেই জানো। সুতরাং এই শ্মশান আগলে না রেখে বউ ছেলের মুখে যাতে একটু খাবার জোটাতে পারো সেই ব্যবস্থা করো দয়া করে।

লম্বা ডায়ালগটা দিয়ে শুকদেবের দোকানঘরের যে লম্বা-চওড়া কাঠের টেবিলটায় ও একসময় দাঁড়িয়ে হাফপ্যান্টের মাপ দিত সেই টেবিলের ওপর ক্যাশ পুরো এক লাখ টাকার বান্ডিল রেখে বলেছিল, এটা তোমার অ্যাডভান্স। বাড়ি নিয়ে যাও, বাড়িতে আলোচনা করো, আমি কাল পুরো পেপার তৈরি করে নিয়ে আসব। পুরো পাঁচ লাখ দেব। বুঝে নাও এবার। আর এইভাবে যদি পচে মরতে থাকো তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। এখনও দোকানটা কেনার মতো অবস্থায় রয়েছে, এরপর ফ্রিতে দিতে চাইলেও কেউ নেবে না।

বলে চলে গেল রাজু। তারপর থেকে শুকদেব হাঁ করে বসে। এই রাজু সত্যিই একসময় ওর পুজোর আগে শার্ট প্যান্ট বানাতে আসত। বড্ড দুরন্ত ছিল ছেলেটা। এসেই শুকদেবের কাঁচি, শেপস্কেল, চক এসব নিয়ে টানাটানি করতে শুরু করত। ওই সব সামলাতে সামলাতেই মাপ নিতে হত, তখন অবশ্য রাজু শুকদেবকে কাকু বলত, এখন বড় হয়ে বলে শুকদেবদা। কেন বলে কে জানে? রাজু কথায় কথায় বলে রেডিমেডের যুগ দাদা।

কিন্তু এই অদ্ভুত যুগটা না আসার আগেও একটা যুগ ছিল যখন শুকদেবের নাম এক ডাকে চিনত গোটা চঞ্চলনগর। শুকদেবের হাতের সেলাই নাকি ভারত-পাকিস্তানের কাঁটাতারের থেকেও শকত। জামা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেলেও সেলাই খুলত না। আর তেমন মাপ। ছেলে বুড়ো বাবা-কাকা দুর্গাপুজোর পাঁচ মাস আগে থেকে ভিড় জমাতো ছিট কাপড়ের মাপ দেবে বলে। পুজোর দু-মাস আগে থেকে অর্ডার নেওয়া বন্ধ। তারপর দিন রাত এক করে হরেক কিসিমের জামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, পায়জামা, ফ্রক, সালোয়ার ব্লাউজের কাটিং, সেলাই... কত রকমের ফোঁড়... ক্রস, সিমিং, রানিং, মুড়ি, সাটিন, ডাল, বখেয়া... ঘর ঘর শব্দ করে

সেলাই মেশিন চলত দিনরাত। নতুন কাপড় আর সেলাই মেশিনের তেলের গন্ধ মিশে এক অপূর্ব্ব ঘোর লাগা পরিবেশ তৈরি হত। রাতের পর রাত কেটে যেত হুঁশ থাকত না শুকদেবের। শ্যামলী মাঝেমাঝে ববিন কেসে সুতো পড়িয়ে দেওয়া, কিংবা তৈরি জামা ইস্তিরি করার মতো টুকটাক কাজগুলোয় হাত লাগাত, কিন্তু ছেলেটা হওয়ার পর থেকে আর পারত না। একবার কিছুদিনের জন্য একটা ছেলেকে অ্যাসিসট্যান্ট রেখেছিল, কিন্তু তার কাজ মোটেই পছন্দ হত না শুকদেবের, তাই মাস খানেকের মধ্যেই বিদায় দিয়েছিল তাকে। কাজ হতে হবে নিখুঁত, খদ্দের যেন আঙ্গুল না তুলতে পারে। সেই সুযোগও কোনওদিন দেয়নি শুকদেব।

বাবা নিজে হাতে কাজ শিখিয়েছিল শুকদেবকে। সেই বারো তেরো বছর বয়েসে কাঁচি ধরা। বাবা বলত, কাঁচিকে এমন পোষ মানাবি যেন চাকরের মতো তোর কথা শুনবে। ভাল কাটিং মাস্টার না হতে পারলে দরজি হতে পারবি না কোনওদিন। এক সময়ে দরজিকে খলিফা বলে ডাকা হত, খলিফা মানে জানিস? ঈশ্বরের দূত। তোর ঠাকুরদা আব্বাস খলিফার কাছ থেকে কাজ শিখেছিল। সব নবাবরা আব্বাস খলিফার বানানো কাপড় পরতেন।

শুকদেব বাবার সঙ্গে রাতে খোলা ছাদের নিচে শুয়ে এইসব শুনত আর মনে মনে কত কিছু কল্পনা করত। ভাবত ও'ও একদিন খলিফা হবে।

কিন্তু এমন কপাল শুকদেবের ছেলেটা হল বুদ্ধিহীন। একেবারেই ল্যাবাগোবা। মাথায় পড়শোনা, সেলাই কাটিং কিছুই ঢোকে না। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স হয়ে গেল এখনও সারাদিন থলথলে চেহারায় হাফপ্যান্ট পরে রেডিয়োতে এফএম চালিয়ে আয়নার সামনে নাচে। মাঝেমাঝে বিশ্রী নাকি গলায় গানও গায়। শ্যামলীও বছর কয়েক হল আর্থারাইটিসে কাত। বিছানা থেকে বিশেষ উঠতে পারে না। শুকদেবের দোকান বসতে শুরু করেছিল বছর দশেক আগে থেকেই। তবু এলাকার কিছু পুরনো মানুষ তার কাছে আসতেন, পাঞ্জাবি, পায়জামা বানাতে অথবা পুরনো জামা প্যান্ট রিফু করাতে। ধীরে ধীরে সেই জমানাও শেষ হয়ে গেল। শুকদেবের দোকানে ঝুল, হাতে হ্যারিকেন। দুর্গাপুজো কখন আসে আর কখন যায় টেরই পায় না আর। শুধু অভ্যাসের বশে দুইবেলা দোকান খোলে। চুপ করে বসে থাকে। কাঠের হ্যাঙ্গারগুলো ঝুলে ভরা, দেওয়াল থেকে পলেস্তারা খসে কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। মেঝের সিমেন্ট অনেকদিন আগেই উঠে গিয়ে ঢলঢলে ইট বেরিয়ে গিয়েছে। খোঁচা দিলে ইঁট উঠে ভেতরের মাটি বেরিয়ে আসে। বর্ষাকালে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকে পুরো ঘরটা। কথা না বলতে বলতে ইদানিং যেন মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই ভুলে গিয়েছে শুকদেব। ব্যাঙ্কে জমানো কিছু টাকার সুদ থেকে কোনওমতে সংসারটা এখনও খুঁকতে ধুঁকতে চলছতে। কিন্তু আর কদিন জানা নেই। মাঝেমাঝে চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ে। তারপর নিজের জং ধরা সেলাই মেশিনটার গায়ে হাত বোলায়।

খবরের কাগজে মোড়া টাকার বান্ডিলটা হাতে নিল শুকদেব। এক লাখ টাকা এখন আর বেশি ভারি হয় না। দুই হাজার টাকার নোট এসে গিয়ে টাকার ওজন কমে গিয়েছে। উঠল। দোকানঘরটার দিকে একবার তাকাল। তারপর ধীরে সুস্থে কাঠের দরজা বন্ধ করতে থাকল। দরজাটারও প্রায় শেষ অবস্থা। নাম কে ওয়াস্তে লাগিয়ে রাখা আর কি।

শ্যামলীর সঙ্গে কি একবার কথা বলা উচিত? বুঝতে পারল না শুকদেব। হ্যাঁ না-র দোনামনাতে শেষ

পর্যন্ত রাতে বিছানায় শুয়ে বলেই ফেলল কথাটা।

আজ আবার রাজু এসেছিল। দোকানটা নিতে চাইছে।

শ্যামলী নিস্পৃহভাবে বলল, কী বলল?

পাঁচ লাখ টাকা দেবে বলছে

শ্যামলী নিশ্চুপ। শুকদেবও চুপ থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করল, কিছু বলবে?

কী বলব?

কী করব?

পাঁচ লাখ পুরো দেবে?

হ্যাঁ, আজ এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে গিয়েছে। কাল কাগজপত্র নিয়ে আসবে বলল, সই করলে বাকিটা দিয়ে দেবে।

এক লাখ দিয়ে দিয়েছে! দেখালে না তো? সামান্য বিস্ময় শ্যামলীর গলায়।

হ্যাঁ, আলমারিতে রেখেছি।

আবার নৈঃশব্দ।

কিছু বলবে না?

ছেলেটা কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত মাথা খাচ্ছে পুরী যাবে বলে।

হুঁ। বলে চুপ করল শুকদেব। তারপর আবার শ্যামলীকে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা রেডিমেড জামা কাপড় কি মানুষের শরীর বোঝে? সব মানুষের কাঁধ কোমর, বুক, ঝুল মুহুরি কি সমান? বলো তাই কখনও হতে পারে?

সবাই তো এখন রেডিমেডই পরে।

আমরা জামা প্যান্ট বানাতাম এমনভাবে ভেতরে বেশ কিছুটা এক্সট্রা কাপড় থাকত, প্রয়োজনে সেলাই খুলে আবার বাড়ানো এত, রেডিমেডে এতটুকুও বেশি কাপড় থাকে না জানো? ছোট হলেই ফেলে দাও। এটা কোনও কথা হল? আর তাই লোকে হামলে পড়ে কিনছে! মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে গোল্লায় গেল?

ওই দোকান আর চলবে না। টাকাটা পেলে দেখো কীভাবে কাজে লাগাতে পারো। ছেলেটা বড় হচ্ছে। ওর জন্য তো কিছু রাখতে হবে। বলে একটু থামল শ্যামলী। তারপর বলল, আর তোমার অতশত ভেবে কী লাভ? মানুষ যেমন চাইছে তেমনই তো হবে। তুমি একা চাইলে তো কিছু হবে না, অত ভেবো না তো।

নাহ কী হবে আর ভেবে? বলে পাশ ফিরে শুল শুকদেব। কিন্তু ঘুম আসছে না। হাজার রকমের হাবিজাবি চিন্তা মাথা কুঁড়ে খাচ্ছে। বার বার মনে পড়ছে শত শত পুরনো কথা। সেই সেলাই মেশিন, সেই নতুন ছিট কাপড়ের গন্ধ, মেশিন তেলের গন্ধ। সব শেষ! সব রেডিমেড...। সব!

সকালে নিজের দোকানে অন্যান্য দিনের মতো চুপ করে বসে নেই শুকদেব। আজ তার মস্ত কাজ। পুরনো সেলাই মেশিনটাকে নিয়ে পড়েছে। খুব ভাল করে মুছে, তেল টেল দিয়ে প্রায় ঝকঝকে করল। তারপর দোকানের দরজা বন্ধ করে বড় কাঁচিটা হাতে নিয়ে মেঝের একেবারে কোণের একটা ইট সরিয়ে গর্ত করতে শুরু করল সরু লম্বা একটা গর্ত।

একটু বেলার দিকে রাজু এল। সঙ্গে আরেকজন লোক। শুকদেবের ততক্ষণে কাজ শেষ। গরমে, পরিশ্রমে ঘেমে স্নান কিন্তু মনের ভেতরে এক অদ্ভুত আনন্দ।

কী শুকদেবদা? বউদির সঙ্গে কথা বললে? ক্যাজুয়ালি জিজ্ঞাসা করল রাজু।

হুঁ বলেছি।

কী বলল বউদি। বেচে দেওয়ার কথাই বলেছে তো?

হুঁ তা বলেছে।

ব্যাস আমি জানতাম। আর তুমি রাজি তো?

রাজুর কথার উত্তর না দিয়ে শুকদেব ওর মুখের দিকে শান্তভাবে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, টাকা এনেছ?

পেপার আর পুরো চারলাখ সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি জানতাম তুমি রাজি হবে। বলে রাজু ওই লোকটাকে ইশারা করতেই লোকটা তার ব্যাগ থেকে স্ট্র্যাম্প পেপার ইত্যাদি সব বার করে ফেলল।

আচ্ছা রাজু তুমি তো এই দোকানের সবটাই কিনবে?

হ্যাঁ নয়তো কী? আধা আবার কেনা যায় নাকি?

ঠিকই তো তাহলে ওই পাঁচলাখের মধ্যে এই ঘরটা, এই সেলাই মেশিনটা আর আমি। তিনজনেই রয়েছি তো?

শুনে হো হো করে হেসে উঠল ওরা দু'জন। তুমি মাইরি শুকদেবদা তোমার সারকিটটা মনে হচ্ছে গেছে। ইমিডিয়েট রিপেয়ায় করাতে হবে।

কেন হাসছ কেন? ভুল কি বললাম? আমার দোকান থেকে কি আমি আলাদা রাজু? এই সেলাই মেশিনটা কি এই ঘর ছাড়া থাকতে পারবে? বলো পারবে? আমি পারব?

রাজু কী বুঝল কে জানে একটু চুপ থাকল তারপর বলল তোমার সেন্টু ইয়ে তোমার সেন্টিমেন্টটা

আমি বুঝছি শুকদেবদা আচ্ছা বেশ আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে আমার দোকানে কাজে নিয়ে নেব। তবে মেশিনটাকে তুমি কাবারিওলাকে ঝেড়ে দাও বস, ও মালের যা অবস্থা দু'দিন পর ওজনেও দাম পাবে না।

রাজুর কথাগুলো শুনল শুকদেব। তারপর কিছু একটা বলতে গিয়েও থমকে গেল।

কী ভাবছ তুমি?

ভাবছি...

রাজু আর কিছু ভাবার সুযোগ দিল না। ব্যাগ থেকে ব্রাউন প্যাকেটে মোড়া কিছু দুই হাজার টাকার বান্ডিল শুকদেবের সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এই নাও। আর চট করে এগুলোতে সই করে ফেলো তো।

পাশের লোকটা কাগজ বাড়িয়ে দিল। ধীরে সুস্থে প্রতিটা পৃষ্ঠায় সই করল শুকদেব।

কাগজটা ফেরত নিয়ে হাঁফ ছেড়ে রাজু বলল, উফ বাঁচালে আমি হেবি টেনশনে ছিলাম, তুমি যা ক্ষ্যাপা লোক, হয়তো শেষ মুহূরতে বলে দিলে বেচব না। যাই হোক উঠছি তাহলে, তুমি কয়েকদিনের মধ্যে দোকানটা ফাঁকা করে আমাকে জানাও। তারপর আমি রিপেয়ারিং শুরু করব। বলে চলে যাচ্ছিল রাজু।

রাজু, একটা কথা...

হ্যাঁ বলো।

তুমি কি পুরো দোকানটা ভেঙে ফেলবে?

নয়তো কী? এই দোকানের কিছু রয়েছে? দেওয়াল, ছাদ সব গিয়েছে। অনেক খরচা রয়েছে আমার।

শুকদেব যেন রাজুর উত্তর শুনতেই পেল না। আবার জিজ্ঞাসা করল ভিতও তুলে ফেলবে?

শুনে আবার হাসল রাজু। তোমার কি মাথাটা একেবারেই গিয়েছে? ভিত তুলব কেন? আমি কি ফ্ল্যাট বাড়ি বানাব নাকি? আর ভিত নষ্ট হয় না।

শুনে একগাল হাসল শুকদেব। তারপর বলল আচ্ছা এসো।

রাজু আর লোকটা চলে গেল। ভাঙা দোকানঘরটার দিকে তাকাল শুকদেব। তারপর ধীরেসুস্থে তালা দিল।

মাস চারেক পর এক রাতে আচমকাই ঘুম ভেঙে গেল শ্যামলীর। নাইট ল্যাম্পের আলোয় দেখল শুকদেব মেঝেতে কান ঠেকিয়ে কী যেন শুনছে।

কী গো কী করছ? ধড়মড় করে উঠে বসল শ্যমলী।

শুকদেবের হুঁশ নেই।

কী করছ কী তুমি?

চুপ চুপ... ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলল শুকদেব। তারপর বিড়বিড় করে বলল, শুনতে পাচ্ছি, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ওই তো শব্দ হচ্ছে... কাজ হচ্ছে... মেশিন চলছে...। আহহ শব্দ হচ্ছে... সেদিন মেঝেতে গভীর গর্ত করে পুঁতে আসা পচে যাওয়া সুতোর বান্ডিল, জংধরা কছু সূচ, ববিন কেস, ক্ষয়ে যাওয়া মাপের ফিতে মাটির তলা থেকে ঘরঘর শব্দ তোলে... শুকদেব প্রাণপনে সেই গন্ধ চাটতে থাকে রাতভোর।

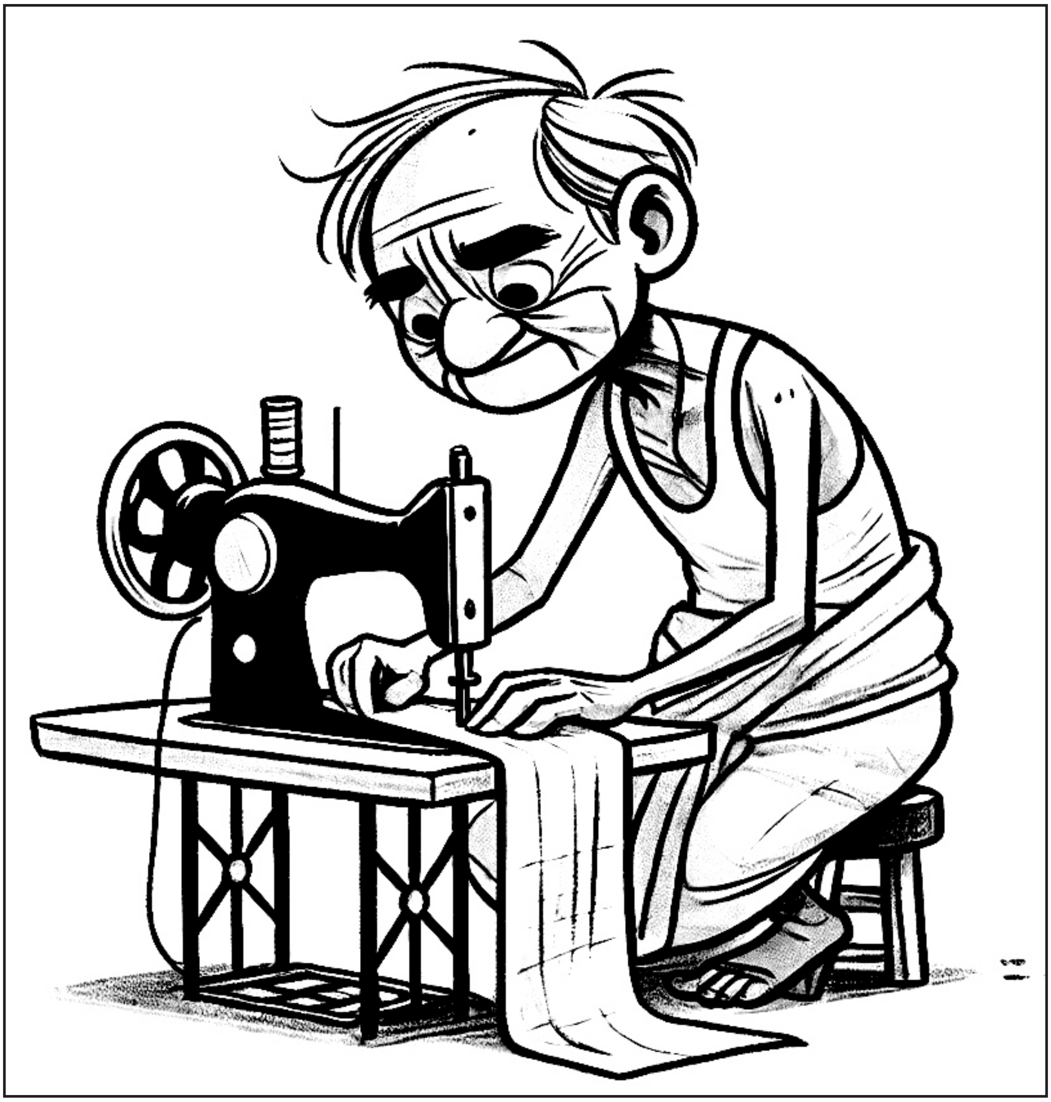

বাজার অর্থনীতি ও আর্থিক সাক্ষরতা

— পার্থ হালদার

সালটি ছিল ১৯৯০, ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতির ইতিহাসে হঠাৎই শুরু হয় পট পরিবর্তন। অর্থনীতির জগতের পরিবর্তনের অভিঘাত এতই প্রবল যে রাজনৈতিক জগতেও এক ব্যতিক্রমী অধ্যায় দেখল সেদিনের প্রধান মন্ত্রী পি. ভি. নরসিংহ রাও ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং ঘোষনা করেছিলেন যে স্বাধীনতার পরবর্তী মিশ্র অর্থনীতি ছেড়ে ভারত উদার অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির পথে হাঁটা শুরু করতে ভারতবাসী ঠিক স্ব ইচ্ছায় গ্রহণ করেছিল তা ঠিক নয়। কারণ সেই সময় ভারতে বিদেশী মুদ্রা ভান্ডার এমন জায়গাতে নেমে এসেছিলো যে আর্থিক সংস্কারের পথ ছাড়া দেশকে আগে নিয়ে যাবার মত আর। খোলা ছিলো না। ভারতের সংসদীয় গনতন্ত্রের ইতিহাসে বিরোধী রাও সেদিন সরকারের দিকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে ছিলেন যার উদাহরণ সত্যিই দুর্লভ। সম্পূর্ণ সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছাড়াও সম্পূর্ণ কার্যকাল বাজার অর্থনীতির পথে ভারতের জয়যাত্রা শুরু। এর পরের এক দশকে ব্যবহারিক অর্থনীতির চালচিত্রটি খুব দ্রুতভাবে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ। ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সেবী ও আই আর.ডি. এর গঠন, মুদ্রা আইন পরিবর্তন সামগ্রিক ভাবে বললে পরিবর্তনের সূত্রপাত আর্থিক এবং বিনিয়োগের জগতকেই সর্বাগ্রে প্রভাবিত করতে থাকে। কিন্তু এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যান কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের কাছেই ছিল প্রায় অজানা। যদিও আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব ছিল সেবীর উপর এছাড়াও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও এ বিষয় সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে। এর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকই হলো ঝুঁকি তাই বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি বিক্রয়ের জন্য এক ধরণের আর্থিক স্বাক্ষরতার পাঠ দেওয়া শুরু করে যা ছিল তাদের বিক্রয়ের কিছু পরিকল্পনা মাত্র। সার্বিক আর্থিক স্বাক্ষরতা যা সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেলো। এক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল প্রয়জনীয় শিক্ষকের সংখ্যার অভাব। এতে আরেকটি নতুন বিপদ মাথা চাড়া দিল, বিভিন্ন Ponzi Scheme, যারা অর্থনৈতিক স্বাক্ষরতার অভাবের আড়ালে গড়ে তোলে তাদের অনৈতিক ও বানিজ্য নিয়ম বহির্ভূত এক ধূসর সাম্রাজ্য। Chit Fund ও Chit সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। তাদের এক অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক প্রচারের মাধ্যমে। Chit Fund বা ছোট ফান্ড কিন্তু কোনো অবৈজ্ঞানিক বিষয় নয় এবং তা আইন সঙ্গত কিন্তু Ponzi Scheme যা মানুষের কাছে অতি বিপজ্জনক, আর্থিক স্বাক্ষরতার ও সচেনতার অভাবে বহু সাধারন মানুষকেই সর্বশান্ত করে। এই Ponzi Scheme কিন্তু একশো মাথা ড্রাগনের মত এর শিকড় সহজে নির্মূল করা যায় না হলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার অন্য অবতারে আর্বিভূত হন। তাই এর পিছনে যে অপবিজ্ঞানটি রয়েছে সেটিকে বোঝা ও ফাঁদে পা না দেওয়ার ক্ষমতাই প্রতারিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। আমরা স্বেচ্ছায় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী উদার অর্থনীতিকে গ্রহন করিনি কেবল মাত্র

পরিস্থিতির চাপে গ্রহন করতে বাধ্য হয়ে ছিলাম তাই কোনো পরিকল্পিত শিক্ষানীতি ও আমাদের ছিল না। শিক্ষা ব্যবস্থার এই শুন্যতা ও বৈষ্যম্য দিনে দিনে প্রকট হতে শুরু করেছে। শুধু তাই নয় আইন প্রনেতা ও আইনের রক্ষকদের মধ্যেও সীমিত আর্থিক স্বাক্ষরতাও দেশের অর্থনীতির ও সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অন্যতম অন্তরায় একটা বিষয় আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে বাজার অর্থনীতির যুগ থেকে আমরা আর পুরানো মিশ্র অর্থনীতির যুগে ফিরে যাবো না। কাজেই বর্তমানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া দরকার। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান আমাদের দেশে। I.C.S.E. এবং C.B.S.E. পাঠক্রমে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়টিকে অনভুক্ত করা হলেও প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো ব্যবস্থা নেই। একটি ছাত্র যখন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষ্যাক্রমকে অতিক্রম করে তখন সঞ্চয় বিনিয়োগ (Saving & Investments), ইপ্শিত ও পরোক্ষ আয়,বস্তু ও প্রয়োজন (Need & Want), কর ব্যবস্থা (Tax), প্রত্যক্ষ (Income & Passive Income), বাজেটিং (Budgeting), সম্পদের প্রকার ভেদ (Asset Class), বিভিন্ন প্রকারের সম্পদের ধারনা এগুলি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনে শিক্ষাগ্রহণের প্রথম ধাপে প্রকারভেদ (Asset Class) সম্পর্কে ধারনা বোধ গড়ে না ওঠে তাই ভবিষ্যৎ জীবনের পরিকল্পনায় যথেষ্ট খামতি থেকে যায়। আমাদের প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোথাও কিন্তু সরাসরি এ সুযোগ নেই। আর্থিক সম্পদ যেমন ফিক্স ডিপোজিট, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড, মুল্যবান ধাতু যেমন সোনা, রুপো, প্লাটিনাম ইত্যাদি, রিয়েল এস্টেট যেমন জমি, বাড়ী, খামার বাড়ী এ বিষয় স্বচ্ছ ধারনা গড়ে ওঠা একান্ত জরুরী। তাই বাজার অর্থনিতির সুফল হিসাবে আজকের দিনে ETF -এবং REIT এর মাধ্যমে সেগুলি যে ঘরে বসেই নিজের সামর্থ অনুযায়ী বিনিয়োগ নিজের জীবনেও সমৃদ্ধ করতে পারেন।

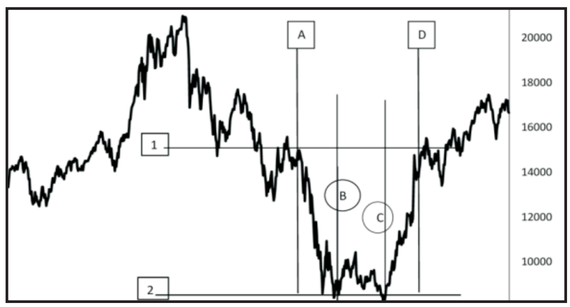

আমাদের স্কুল গুলিতে বিভিন্ন ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল, বিজ্ঞান, গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয় ঠিকই কিন্তু দৈন্যদিন জীবনের লড়াই এর জন্য যে অর্থনৈতিক কৌশল গ্রহন করা উচিৎ তার জন্য প্রয়োজনীয় না। বহু মানুষই মনে করেন যে আর্থিক সাক্ষরতা মানেই কেবল মাত্র শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত ধারনা তা কিন্তু মোটেই নয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে আর্থিক স্বাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মাত্রাবোধ এবং জীবনের অনিশ্চিত ঘটনা প্রবাহ যা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতার বাইরে তার জন্য প্রস্তুত থাকা ও সর্বশেষে জীবনের যে সময় কর্মক্ষমতা চলে সেই সময় অপরের বোঝা না হয়ে পরোক্ষ আয়ের ভারতের পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী এদেশে একটি বড় অংশের প্রবীন নাগরিক নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের রক্ষনাবেক্ষন করতে পারেন না। এক্ষেত্রে পুরুষদের সমস্যা আরও বেশী কারন তার সেক্ষেত্রে আর্থিক সাক্ষরতার মাধ্যমে সতর্ক থাকাটাই বোধহয় একমাত্র রাস্তা। পুরুষদের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ সমস্যা হল যদি কোনো পুরুষ পারিবারিক বিবাদের কারনে কোর্টে যান সেক্ষেত্রে Maintance টাকা দেওয়ার কথা বলে তাতে ধরে নেওয়া হয় সেই পুরুষটির বর্তমানের আয়ের সাথে তাল রেখেই তার ভবিষ্যতের আয়ের বৃদ্ধি ঘটবে কিন্তু বাস্তবে তা

নাও হতে পারে, বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগীতায় যার পারিবারিক বিবাদের ক্ষেত্রে আর এক জনকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত নিরাপত্তা নেবার দায়িত্ব নিতে হয়। তাই সামাজিক সুরক্ষা ও তার নির্দিষ্ট পথগুলি সম্পর্কিত জ্ঞান ও আর্থিক সাক্ষরতার একটি বড় দিক। আর্থিক সাক্ষরতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ শেয়ার বাজার। আমাদের বাঙালী সমাজে আমি বহু বিষয়ে পন্ডিত ও কর্মজীবনে সফল মানষদের সাথে কথা বলেছি। তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের কর্ম ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল কিন্তু শেয়ার বাজারের প্রসঙ্গ এলেই খুব অবলীলাক্রমেই বলেন, এ বিষয়টি আমি ঠিক বুঝি না।এর জন্য অনেকে গর্বও অনুভব করেন। কিন্তু আমার মনে হয় বাজার অর্থনীতির মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে হলে শেয়ার বাজারের স্বচ্ছ ধারণা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।এ যেন সেই সুকুমার রায়ের 'বিদ্যা বোঝাই বাবুমশাই' কবিতার মতো উদার অর্থনীতির যুগে জীবন যুদ্ধে জেতার সাঁতারটাই তো আর্থিক সাক্ষরতা।তাই যারা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির গণ্ডি বহুদিন আগেই পেরিয়ে গেছেন তাদেরও তো বিভিন্ন শিক্ষা জগতের কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

উদার অর্থনীতির দৌড় শুরু হবার পর থেকে তার বিরোধিতাতেই আমাদের জীবন কেটে গেছে।তাছাড়া মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে বাণিজ্য বিমুখতা যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। যদিও বাঙালির অতীত ইতিহাস কিন্তু তেমনি ছিল না।চাঁদ সদাগরের সময় থেকেই বহু উদ্যোগী বাঙালি আমাদের চোখে পড়ে। বৃটিশ শাসনকালেও উদ্যোগী বাঙালি ও তাদের কর্মকাণ্ড ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু তার পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাণিজ্য জগৎ থেকে বাঙালি লুপ্তপ্রায় প্রজাতি হয়ে ওঠার পেছনে মূল কারণই বাঙালির নিজেকে 'ইক্যুইটি কালচার' থেকে দুরে সরিয়ে নেওয়া ।এককালে স্বয়ং রাণী রাসমণির মুখে যে কোম্পানির কাগজের কথা শোনা যেত, তা আজ তলিয়ে যায় স্মৃতির অতীতে।

শেয়ার বাজার তো কেবল বিনিয়োগকারীদেরই নয়। এই বাজার তো উদ্যোক্তাদের জন্যও। প্রাইমারি মার্কেট থেকে পুঁজি গ্রহণ করে নিজেদের উদ্যোগকে বাড়িয়ে তোলা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে একটি জাতি বা দেশ গঠন করার কথা আমরা তো স্বপ্নেও ভাবি না। কাজেই যারা ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে রয়েছেন বা আসতে চাইছেন তাদেরও তো প্রয়োজনীয় আর্থিক সাক্ষরতার প্রয়োজন আছে। তাই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ও কলেজ শিক্ষায় আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট। নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে শেয়ার বাজার যাওয়া আর রেসের মাঠে যাওয়া প্রায় সমার্থক শব্দ ছিল। কিন্তু প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি দুটি মার্কেট এক এক করে কখনই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা আমরা নিজেরাই করিনি, অন্যকে বোঝানো তো অনেক দুরের কথা। তাই আগামী দিনে আমাদের অর্থনৈতিক দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে সর্বস্তরের মানুষদের জন্য এই বিষয়টি আর বোধহয় উপেক্ষা করা যায় না।

মোটের ওপর আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সারা ভারতবর্ষব্যাপী যদি আর্থিক সাক্ষরতার চিত্রটি দেখা যায় তা যেন বড় ম্লান। অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে যত আলোচনাই হোক না কেন আজও এই বিষয়টিকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্য স্তরে স্কুলগুলির মধ্য কোনওরকম পাঠক্রম চালু করার কথা আমি অন্তত শুনিনি। কেবলমাত্র মণিপুর এ বিষয়ে কিছুটা অগ্রণী। আজ আমরা যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চলেছি তার ফলস্বরূপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে সুফল আমরা পেতে চলেছি তাকে কাজে লাগিয়ে বহুবিধ কর্মকাণ্ডই তো গড়ে তোলা যায়। যেমন Algo Trading- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে সর্বসাধারণের কাছে তা অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে

উঠতে পারে। কিন্তু আমরা তা আন্তরিক ভাবে না চাইলে সেটা তো আকাশ থেকে পড়বে না আর আজকের দিনে আর্থিক সাক্ষরতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে' রকমের কিছু করলেও চলবে না।১৯৯০ সাল থেকে আজ প্রায় ৩৪ বছর কেটে গেছে, সেদিনের পৃথিবীর সাথে আজকের পৃথিবীর তফাত তো অনেক। তাই প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে আর্থিক সাক্ষরতার প্রচার ও প্রসারও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আজও যদি শিক্ষা সংক্রান্ত বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উক্ত বিষয়ে পাঠ্যসূচির উপর আলোকপাত না করতে পারে বা তাগিদ অনুভব না করে তা তো পুরো দেশের কাছেই যথেষ্ট হতাশাজনক। তাছাড়া আমাদের দেশের দুটি বৃহত্তম স্টক এক্সচেঞ্জের BSE ও NSE তাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় বেশ কিছু কোর্স চালু করেছে, যেগুলি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সংক্রান্ত ধারণার বিষয়ে যথেষ্ট উপোযোগী।তাছাড়াও বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে নিজেদের স্বনিযুক্ত ও পেশাদার হিসাবেও গড়ে তোলা যায়। কিন্তু সেই লক্ষ্যে এগোতে গেলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কিছুটা ধারণা থাকাও প্রয়োজন। একজন ছাত্র তার ভবিষ্যৎ জীবনে কী কী ধরনের সামাজিক সুরক্ষা পেতে পারে, কীভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তার জীবনের আর্থিক পরিকল্পনা করবে তা সে যে কোনও পেশাতেই যুক্ত থাকুক না কেন, এই ব্যবহারিক জ্ঞান তো তার জীবনে এগিয়ে চলার পাথেয়।

ভারতের অর্থমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, আমাদের দেশের অর্থনীতি ২০২৮-২০২৯ সাল নাগাদ ৫ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে অর্থনৈতিক সাক্ষরতার ব্যবস্থা না থাকলে তার সুফল আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম কিনা সেটাই বিচার্য বিষয় আশা করব, আগামী দিনে আমরা আরও বেশি সচেতনতার সঙ্গে বাস্তব অবস্থায় তাল মিলিয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে গড়ে তুলব।

পুরুষ

— সুবোধ সরকার

যে পুরুষ দিতে পারে সেই তো পুরুষ
পুরুষের রূপে মুগ্ধ হতে হতে আজ
পৃথিবীতে বাকী পড়ে আছে কত কাজ
পুরুষ পুরুষ হয় পুরুষের গুণে।

পুরুষ গর্জন করে পাহাড়ে কন্দরে
পুরুষ অর্জন করে বন্দরে বন্দরে
একটি পুরুষ শিশ্ন জঙ্গলে জঙ্গলে
বড় হয় সিংহের হাহাকার শুনে।

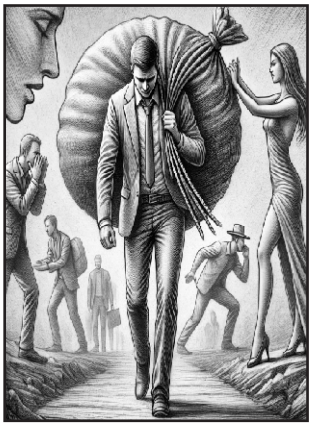

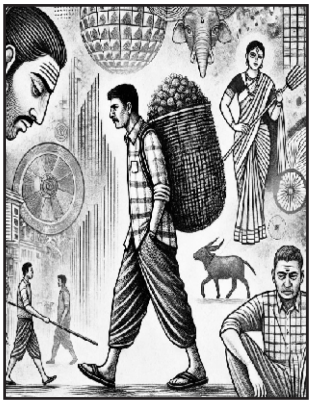

অসফল পুরুষের বেঁচে থাকা দায়।
কর্পোরেট মানে শুধু টার্গেট টার্গেট
আঠেরো তলায় উঠে মনে পড়ে যায়
পুরুষ পুরুষ হয় না-পেলে ফাল্গুনে।

যদি কেউ নাই আসে তার ডাক শুনে
নারীকে অগ্রাহ্য করে যেতে হবে একা
রাজদ্বারে বিপ্লবে পাবে তার দেখা
পুরুষ পুরুষ হয় আগুনে আগুনে।

তার ঝলসানো রূপে সূর্য উঠে আসে
যাকে ভালবাসে তাকে আজো ভালবাসে।

BATTERY VS ICE

— শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

রাস্তায় বেরোলে এখন চারিদিকে নিঃশব্দ বিপ্লব। একেবারেই নিঃশব্দে পাশ দিয়ে হুশহুশ করে ছুটে যায় বিভিন্ন ইলেকট্রিক ভেহিকল বা ইভি। কিন্তু জানেন কি, আমাদের দেশে প্রথম ইলেকট্রিক ভেহিকল বা ইভি কবে রাস্তায় নামে, গাড়িটির কী নাম ছিল আর কোন সংস্থা তা তৈরি করেছিল? ১৯৯৩ সালে ভারতের প্রথম ইভি রাস্তায় নামে। নামটি ছিল খুব সুন্দর,'লাভবার্ড'। জাপানের ইয়ুসকাওয়া ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় সংস্থা এডি কারেন্ট কন্ট্রোল এই গাড়িটি তৈরি করেছিল। টু-সিটার লাভবার্ড নামে এই ইভি ছিল লেড অ্যাসিড ব্যাটারিচালিত। কেরল ও তামিলনাড়ুর দুটি কারখানায় তৈরি হত এই গাড়িটি। কিন্তু পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা ও পুরনো ব্যাটারি প্রযুক্তির কারণে লাভবার্ড গাড়িপ্রেমীদের ভালোবাসা পায়নি। পরে মইনি গ্রুপ 'রেভা' নামে ছোট একটি ইভি বাজারে আনে। মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রার হাত ধরে রেভা পরবর্তীকালে নিজের নাম পাল্টে ফেলে হয়ে যায় 'ইটু-ও'। ১৯৯৬ সালে প্রথম ব্যাটারিচালিত থ্রি হুইলার 'বিক্রম্' বাজারে আনে স্কুটারস ইন্ডিয়া লিমিটেড। আর আঠেরোজন যাত্রী নিয়ে চলতে পারে এমন ইলেকট্রিক বাস আনে ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেড বা ভেল। ইভি বিপ্লব এখন পুরোদমে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিয়ে ভারতে ইভির ছড়াছড়ি। তাদের বিভিন্ন নাম, বিভিন্ন দাম। বর্তমানে টাটা, মাহিন্দ্রা ছাড়াও চিনা সংস্থা মরিস গ্যারাজ, বিওয়াইডি নিয়ে এসেছে আধুনিক আর কেতাদুরস্ত একাধিক ইভি স্মল কার ও সেডানের মডেল।

কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমানো, পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচতে আর জলবায়ুর উপর ক্ষতিকারক প্রভাব কমাতে পেট্রোল, ডিজেল চালিত গাড়ির ব্যবহার কমাতে সওয়াল চলছে জোরদার। ইভি বা ব্যাটারিচালিত গাড়িই তো ভবিষ্যত। কিন্তু মানুষের যাতায়াত বা মোবিলিটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তরল জ্বালানি পুড়িয়ে গাড়িকে শক্তি জোগানো ইন্টারনাল কমবাসশন ইঞ্জিন বা আইসিইচালিত গাড়ির কথা উঠবেই। আচ্ছা,এটা কি বলা যায় যে, এখনই তরল জ্বালানি চালিত গাড়ির মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেছে?

ব্যাটারি বনাম আইসিই-র একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যাক ঃ-

১. শহর ছাড়িয়ে দূরে পাড়ি দিতে এখনও ভরসা পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ি, কারণ পথে জ্বালানি ভরার পাম্প অফুরন্ত। সেই তুলনায় ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনের নেটওয়ার্ক এখনও যথেষ্ট নেই। তাই রাস্তায় ইভি-র ব্যাটারির চার্জ শেষ হলে বিপদে পড়তে হতে পারে।

২. ইভিতে থাকা মোটর ও তার সঙ্গে গাড়ির বিভিন্ন সেনসর খারাপ হলে তা ঠিক করা কিছুটা হলেও সমস্যাবহুল। কারণ, এখনও ইলেকট্রিক গাড়ি সারানোর যথেষ্ট শিক্ষিত মেকানিক প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে পাওয়া যায় না।

৩. ইভি চালান না এমন মানুষজনের প্রথম প্রথম এই গাড়ি চালাতে একটু অসুবিধেই হয়। কারণ, গাড়িগুলির এঞ্জিন না থাকায় নিজস্ব কোনও আওয়াজ থাকে না। তাই রাস্তায় চলার শব্দ আর বাইরের বিভিন্ন শব্দ প্রবলভাবে ড্রাইভিংকে প্রভাবিত করতে পারে।

৪. কম ব্যাটারি পাওয়ারের ইভি-র পাওয়ার আর টর্ক পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ির তুলনায় কম হয়। তাই হাইওয়েতে গতি তোলা বা অন্য গাড়িকে ওভারটেক করার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। আধুনিক হাই পারফরম্যান্স ইভিগুলির কথা অবশ্য আলাদা। যেগুলি একেবারে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা থেকে ষাট বা একশো কিমি প্রতি ঘণ্টা গতি তুলতে যা সময় নেয় তা ইন্টারনাল কমবাসশন এঞ্জিনচালিত গাড়িকে লজ্জায় ফেলে দেবে।

৫. ইভি চালানোর অভ্যেস তৈরি করতে হয়। কেননা, ইভি-র বিশেষ কিছু ফিচার্স থাকে, যা রপ্ত করতে হয়।

৬. ইভি-র দাম সাধারণ জ্বালানিচালিত গাড়িগুলির থেকে একটু বেশিই। বৈদ্যুতিক গাড়ির ধরণ,আকার বা প্রযুক্তি যাই হোক না কেন,এগুলি কিনতে গাঁটের কড়ি একটু বেশিই খরচ করতে হবে।

৭. শহরাঞ্চলে প্রতিদিনের যাতায়াত অর্থাৎ ডেলি কমিউটের ক্ষেত্রে ইভি-র জুড়ি নেই। চালানোর সুবিধা ও প্রতি কিলোমিটারে কম খরচ ইভি-কে সবসময় আইসিই চালিত গাড়ি থেকে এগিয়ে রাখে।

৮. ইভি-তে এঞ্জিনের জটিলতা নেই, নেই কোনও দূষণের সমস্যা,তার উপর কিছুটা হলেও কর বা ট্যাক্সে ছাড় পাওয়া যায়। ফলে,বড় শহর ও শহরাঞ্চলের মানুষ এখন ইভির দিকেই বেশি ঝুঁকছেন।

৯. বিশ্বের বাজারে তেলের দাম ওঠানামা করার উপর নির্ভর করে এখন রোজ পেট্রোল, ডিজেলের দাম ওঠানামা করে। তাই জ্বালানির দাম কখনও কখনও পকেটে ছ্যাঁকাও দেয়। ব্যাটারির ক্ষেত্রে এরকম কোনও সমস্যাই নেই। চার্জ দাও আর গাড়ি চড়ো।

১০. আধুনিক ইলেকট্রিক ভেহিকলগুলির ব্রেকিং থেকেও বিভিন্নরকম সুবিধা পাওয়া যায়। বৈদ্যুতিক গাড়ির মোটর দুটি দিকে চলতে পারে। যখন চালক গতি বাড়ায়,তখন মোটরটি ড্রাইভের দিকে ঘুরে গাড়িটিকে সামনের দিকে এগোতে সাহায্য করে। আবার যখন অ্যাক্সিলারেশন বন্ধ থাকে তখন মোটরটি উলটো দিকে ঘুরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে যা আবার তার ব্যাটারিতেই ফিরে আসে। টাটা-র মতো অটোমেকাররা এই রিজেনারেশন টেকনিক কাজে লাগিয়ে ব্রেকিং পদ্ধতি আরও সহজ করে দিয়েছে। এই রিজেনারেশন পন্থায় ব্রেক না করেই গাড়ির গতি কমানো সম্ভব হয়। এতে ব্রেক প্যাডের ক্ষয় কম হয় পাশাপাশি ব্যাটারিও কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারে।

বিশ্ব পরিবেশ ও গাড়ির দূষণ নিয়ে সাম্প্রতিক কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০৩৩ সালের মধ্যে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক গাড়িকেই রাস্তায় চলার ছাড়পত্র দেওয়া হবে। ক্রমশ বাড়তে থাকা বাজার আর জনপ্রিয়তার কারণে ইভি আকর্ষণীয় বিকল্প হলেও,যাঁদের গাড়ি ছাড়া একেবারেই চলে না, তাঁদের একমাত্র বাহন হিসেবে এখনও ইভি নিজের জায়গা তৈরি করতে পারেনি। তাই কেনার আগে প্রয়োজন আর পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ইভি কেনা উচিত।

la exotic

ঠিকানা- ৯৫/D১, বসুন্ধরা, চিংড়িঘাটা, কলকাতা , ৭০০১০৫
যোগাযোগ নম্বর - +91 89813 32800
ওয়েবসাইট, www.laexotic.in

প্রথমে, আমাদের জানা উচিত SOLO ভ্রমণকারীরা কে?

হ্যাঁ! এই শব্দের আক্ষরিক মানে আমরা সহজেই অভিধান দেখে পেতে পারি, কিন্তু এটি আসলে কি তেমনই? না। তারা এমন কেউ, যারা একেবারে একা ভ্রমণের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্ণভাবে অনুভব করতে চান। এখন কেন "SOLO" শব্দটি ভ্রমণের সাথে যুক্ত করা হয়েছে? কারণ, এই ব্যক্তি নতুন স্থান, নতুন সংস্কৃতি, নতুন খাবার, নতুন মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান, কোনরকম দায়িত্ব ছাড়াই।

প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করে, ছেলেরা পুরুষে পরিণত হয়, কিন্তু তাদের মন সেই যুবকই থেকে যায়। তাই অনেক পুরুষ Solo Trip এর জন্য বেরিয়ে পড়েন, শুধুমাত্র জীবনের প্রতিটি ধুকপুকি উপলব্ধি করতে। আমরা এমন একটি সমাজে বাস করি যেখানে মহিলাদের প্রতি সহানুভূতি এবং মনোযোগ দেওয়া হয় এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে কথা বলা হয়। তাহলে পুরুষদের কী? পুরুষ ও মহিলা উভয়ই মানুষ, তাই তাদেরও ভ্রমণে বেরিয়ে গিয়ে নিজেদের জীবন পুনরুদ্ধার ও নতুন করে শুরু করা উচিত।

কখনও কখনও আমরা ভুলে যাই যে কাজ যেমন ক্যারিয়ারে উন্নতি এবং আর্থিক সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি একটুকু বিরতি নেওয়া, নতুন জায়গায় ঘুরে আসা জরুরি। কারণ, একটানা কাজ করলে যেমন একটি যন্ত্র বিকল হয়ে যায়, তেমনি মানুষও অতিরিক্ত কাজের চাপ সহ্য করতে পারে না, তাকে বিশ্রাম প্রয়োজন! তাই এখন পুরুষেরা ধীরে ধীরে সামাজিক প্রচলিত ধারণা ভেঙে একাই সময় কাটানোর জন্য বেরিয়ে আসছেন, যা তাদের জীবনে নানা রঙ নিয়ে আসে। একটি পৃথিবী যেখানে আমরা প্রায়ই অসংখ্য প্রতিযোগী দাবির দ্বারা বোম্বার্ডেড হয়ে থাকি, সেখানে নিজস্ব গতিতে চলার স্বাধীনতার আরাম উপভোগ করুন। সাধারণ জীবনে প্রতিদিন, সারাক্ষণ এত সব তথ্য আসে ফোন, টিভি, রেডিও, সোশ্যাল মিডিয়া, ইমেইল - এখন এটি সময়, তখন শুধু নীরবতা শুনুন, প্রকৃতির শব্দ, গাছের মধ্যে বাতাসের মৃদু বাতাস, অবিক্ষিপ্ত ছোট কোনও প্রাণীর মৃদু শব্দ বা পাখির ডাকা।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাদ ও পছন্দ ভিন্ন, তাই তাদের ভ্রমণ পরিকল্পনাও এবং গন্তব্য নির্বাচনও ভিন্ন হয়। আপনি আপনার নিজের পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন, যখন খুশি যা খুশি খেতে পারেন এবং প্রতিদিন যতটুকু বা যত বেশি হাঁটতে চান, ততটুকু বা তত বেশি হাঁটতে পারেন।

সর্বদা আপনার চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকুন। আপনার অতিরিক্ত সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই, তবে জানুন আপনি কোথায় আছেন এবং কোথায় এড়িয়ে চলা উচিত। নিজেকে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে ফেলে দেবেন না, এবং যদি আপনার অন্তর্নিহিত অনুভূতি আপনাকে জানান যে আপনি অস্বস্তিতে আছেন, তবে সেটি শুনুন এবং সরে আসুন।

La exotic একটি ভ্রমণ সংস্থা যা Solo Travel সমস্ত নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এই ধরণের বাজেট-বান্ধব SOLO TRIP আয়োজন করে। আমরা এমন কিছু গন্তব্যের পরামর্শ দিচ্ছি যেখানে অনেক SOLO Traveller ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন, কিছু কাছাকাছি এবং কিছু ভারতের মধ্যে। কিছু মানুষ নির্জন স্থানগুলোতে ঘুরতে যান, যেন তারা বিশ্রাম পেতে পারেন।

সান্তুক (Santook) - সান্তুক চারদিকে সবুজে ঢাকা একটি শান্ত গ্রাম। প্রকৃতির কোলে আপনার আত্মাকে বিষমুক্ত করার জন্য আমরা আপনাকে একটি দুর্দান্ত সুযোগ দিচ্ছি।

কিভাবে পৌঁছাবেন ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দর ১০০ কিলোমিটার দূরে। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন ৯০ কিলোমিটার দূরে। কালিম্পং বাস স্ট্যান্ড ১৮ কিমি।

সান্তুক পরিদর্শনের সেরা সময় ঃ নভেম্বর থেকে এপ্রিল।

কি কি সাথে রাখবেন ঃ পরিচয় প্রমাণ, পোকামাকড় প্রতিরোধক, টর্চ, রেইনকোট, ওষুধ, হাইকিং বুট।

আকর্ষণ ঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জলপ্রপাত, স্থানীয় সংস্কৃতি, পাইন ভিউ নার্সারি, ডিওলো (Deolo) পাহাড়, Changey Water falls.

চটকপুর (chatakpur) - চটকপুর হল পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার সেঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট, পরিবেশ বান্ধব গ্রাম, যার উচ্চতা ৭,৮৮৭ ফুট।

কিভাবে পৌঁছাবেন ঃ বাগডোগরা বিমানবন্দর ৫৮ কিমি কিলোমিটার দূরে। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন ৪৮ কিলোমিটার দূরে।

চটকপুর পরিদর্শনের সেরা সময় ঃ জুন থেকে সেপ্টেম্বর।

কি কি সাথে রাখবেন ঃ পরিচয় প্রমাণ, টর্চ, রেইনকোট, আরামদায়ক জুতো, ওষুধের বাক্স।

আকর্ষণ ঃ পাখি পর্যবেক্ষণ, শান্ত প্রকৃতি, ঔষধি উদ্ভিদ উৎপাদন, চটকপুর ওয়াচটাওয়ার, টাইগার হিলের শীর্ষে পৌঁছানোর ট্রেকিং পয়েন্ট।

ডালগাঁও (Dalgaon)- ডালগাঁও উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স বা ডুয়ার্স অঞ্চলের একটি সুন্দর গ্রাম যেখানে প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্য রয়েছে। এই সুন্দর স্থানটি বিন্দু, ঝালং, সামসিং, সুন্তলেখোলা, পারেণ এবং নেওরা ভ্যালি জাতীয় উদ্যানের মতো অন্যান্য সুপরিচিত গন্তব্যস্থলের খুব কাছে অবস্থিত।

ডালগাঁও পরিদর্শনের সেরা সময় ঃ নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি ।

কি কি সাথে রাখবেন ঃ পরিচয় প্রমাণ, পাসপোর্ট সাইজ ছবি আকর্ষণ বন্যপ্রাণী দর্শন গোরুমারা জাতীয় উদ্যান, চপরামারি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান ।

কিছু মানুষ ধর্মীয় স্থান যেমন কেদারনাথ, বারাণসী পরিদর্শন করতে যান আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য। কিছু লোক Leh Ladakh অ্যাডভেঞ্চার বাইকিং ট্যুর পছন্দ করে এবং কেউ কেউ আন্দামানে স্কুবা ড্রাইভিং পছন্দ করে।

প্রত্যেক স্থানেই কিছু উপহার আছে, তবে কিছু বিষয় রয়েছে যা সব স্থানেই খেয়াল রাখতে হয় — প্রত্যেক স্থানে কিছু নিয়ম এবং বিধি-নিষেধ রয়েছে, যেগুলি মেনে না চললে স্থানটির প্রতি অসম্মান করা হয়। কিছু স্থান এমনকি চুরি এবং প্রতারণার সমস্যা থাকে, তাই সেসব স্থানে যাওয়ার আগে ভালোভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন। কোনো স্থানে গেলে সেই স্থানটির সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা জানাটা জরুরি, কারণ স্থানভেদে এটি পরিবর্তিত হতে পারে, আর একটি সাধারণ আচরণ বা ভাষা হয়তো তেমন ভালোভাবে গ্রহণ করা নাও হতে পারে।

পুরুষদের SOLO ভ্রমণ অন্যান্য ভ্রমণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি আরও বেশি গণ্য করা উচিত, কারণ প্রত্যেকেই তাদের জীবন পুরোপুরি উপভোগ করার অধিকারী।

Banchbo Healing Touch Foundation

A touch of healing...

South Kolkata & Saltlake with adjacent areas

A Multidisciplinary 24 × 7 Geriatric Home Health care initiative.

"One-Stop" Elder Care Solution.

Aging can bring challenges!
Are you or any of your loved ones facing this issue?

Reach out to us. We are here to make a positive impact on the lives of senior citizens of Saltlake and adjacent areas, helping them achieve their well-being, dignity, and quality of life.

Offering compassionate, comprehensive, holistic, advanced and most affordable Round the Clock Geriatric Healthcare Assistance.

With 18+ years of remarkable existence we are offering:

- Multidisciplinary Support
- Comprehensive Care
- 24 × 7 Emergency Support
- Customized Preventive Packages
- Added Support
- Care 360° Support

For membership: +91 87775 65221 / +91 82405 74605

Unit Office: 1/1B/1 Ramkrishna Naskar Lane, Kolkata - 700010

Main Office: 54, Barada Avenue, Garia, Kolkata - 700084 (Ground floor & 2nd Floor), West Bengal, India

Help Desk Unit Office: +91 9903584759

Help Desk: +91 9903388556 / +91 9231914370 *(10am to 6pm for General Queries)*

Email: banchbohealingtouch07@gmail.com **Website:** www.bhtf.org

Facebook: www.facebook.com/BANCHBO

Scan QR Code

Studio Salvador

OUR SERVICES

- HAIR CUT
- HAIR STYLING
- HAIR COLOUR
- HAIR SPA
- BODY MASSAGE
- HAIR TREATMENT
- BODY POLISHING
- FACIAL
- MANICURE
- PEDICURE
- FULL BODY SPA
- THREADING
- WAXING

90515 85500
89108 48092

STUDIOSALVADORSPA@GMAIL.COM

STUDIO SALVADOR

All Type of Body Spa & Massage Available

SALTLAKE, BG-45, KOLKATA - 700 091

রম্যরচনা

উত্তম মধ্যম পুরুষ

— প্রকল্প ভট্টাচার্য

ব্যাকরণগত ভুল নয়, এই নামকরণ ইচ্ছাকৃত। আমি, আমরা, আপনি, এবং আপনারা অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়েই লেখাটার এমন নাম। তাছাড়া নামটার অন্য একটি ব্যঞ্জনা আছে, আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। পুরুষরা তো প্রতিনিয়ত হাড়ে হাড়ে টের পাই!

কথাটা স্পষ্ট হলো না? তাহলে একদিনের ঘটনা বলি। প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমার বাহন আক্টিভা স্কুটারের পিছনে বৌকে বসিয়ে চলেছি। না কোনো প্রমোদ ভ্রমণে নয়, ওর কলেজে ওকে পৌঁছে দিয়ে আমি অফিস যাবো, এটাই নিত্যকার রুটিন। এর জন্য আমাকে অফিস টাইমে পড়িমরি করে গাড়ি চালাতে হয়, কখনো অফিসে বসের বক্রোক্তিসহ লেটমার্কও জোটে, কিন্তু না, এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তো সেদিন হলো কি, ভীড়ের মধ্যে আর একটা ব্যস্ত বুলেট বাইক পিছন থেকে তেরচা হয়ে এসে ধাক্কা মারলো সটান আমার স্কুটারে। আমি চমকে কেঁপে উঠলাম, এবং মুহূর্তখানেক পরেই আবিষ্কার করলাম ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমার অর্ধাঙ্গিনী ভূপতিতা!!

অন্য কিছু না দেখে আমি আগে গাড়িটা রাস্তার ধারে পার্ক করে বৌকে রাস্তা থেকে তুলে ধরে একটা অটোয় বসিয়ে কাছের হাসপাতালে নিয়ে ছুটলাম। দেখে মনে হচ্ছিল বিশেষ আঘাত লাগেনি, তবু সাবধানের মার নেই। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগে ভরতি করে, অফিসে নাম ঠিকানা লিখে সবে একটু রিসেপশনের চেয়ারে বসেছি, দুজন হোমরাচোমরা ভদ্রমহিলা এসে আমাকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরম্ভ করলেন। কী ঘটনা ঘটেছিল, বৌয়ের চোটটা ঠিক কেমন করে লাগলো, এইসব। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞাসা করবার পর একজন উঠে ভিতরে চলে গেলেন, অন্যজন আমাকে পাহারা দেওয়ার ভঙ্গীতে বসে রইলেন পাশের চেয়ারে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, যান, এবার আপনি ভিতরে গিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন। ভিতরে গিয়ে জানতে পারলাম, ওই দুই মহিলা আসলে সাধারণ পোশাকের পুলিশ। সত্যিই পথ দুর্ঘটনা হয়েছে নাকি আমি বৌকে মারধোর করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, সেটাই জানবার চেষ্টা করছিলেন এতক্ষণ। বৌকেও বারবার বলেছেন নাকি, নির্ভয়ে জানাতে যে সত্যিই আমি ওকে মারধোর করেছি কি না। একবার ও যদি হুঁ বলতো, আমি আজ গারদে বসে লপসি খেতাম!! মানে, কী একটা অবস্থা!!

আর একদিনের ঘটনা। সপরিবারে চিড়িয়াখানা বেড়াতে গেছি, সঙ্গে এক বন্ধুর পরিবার। দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত আমি একটা গাছের তলায় বেঞ্চে বসেছি, বন্ধুর স্ত্রীও বসেছেন পাশে। বন্ধু এবং আমার স্ত্রী গেছে খাবারের যোগাড় করতে। ঠিক তখনই কিছু পুলিশ এসে আমাকে জেরা শুরু করলো। আমি কে, এখানে কেন বসে আছি ইত্যাদি। পাশের মহিলা আমার স্ত্রী নয় শুনে তো ইভ টিজিং এর কেস দেয় আর কি! কোনমতে তাঁর হস্তক্ষেপে সেদিন মান বাঁচলো। উফফ, মনে হচ্ছিল যেন ধরণী দ্বিধা হও!

তারপর থেকে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, পুরুষ মানেই উত্তম মধ্যম কেস। অফিসে বার্ষিক আপ্রেইজালে অত ভয় করি না, যতো ভয় করি বৌ তার বাপের বাড়ি (অথবা পরিবারের যে কারোকে) ফোন করবার সময় আমার আলোচনা করলে। কারণ হলো, কম বেশী, সত্যি মিথ্যে কেউ যাচাই করবে না, তার কথাই একবাক্যে সবাই মেনে নেবে এবং তার আরোপিত দোষের গুরুত্ব অনুযায়ী আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

তাই বাড়িতে লোভনীয় রান্না হলে খাবার সময় আমার পাতে সেই পদ না পড়লেও (অথচ লোভ করে বাজারটা আমিই করেছিলাম), আমার অনুরোধ বা বক্তব্য হামেশাই ভুলে যাওয়া হলেও, আমার চাহিদাগুলো অধিকাংশ না মানা হলেও, আমি মুখ খুলে প্রতিবাদ করি না। সেই কবেই কবি বলেছেন, বাবা ব্ল্যাক শিপ। বাবা হয়েছি যখন, সংসারের ব্ল্যাক শিপ হয়েই তো থাকতে হবে! না হলে উত্তম মধ্যম!

With Best Compliments from :

Gemith™
Pharmaceuticals
A Shekar Group of Companies

GEMITH PHARMACEUTICALS
Plot.no.23/Eastern, Survey No 672
Shanthi Nagar, Uppal, Uppal Khalsa Mandal,
Medchal Malkajgiri Dist.T.S
Call : 9903959170

Sunflower

Sole Sapling Shoppe

A Unit of Vedic Plantation

Our Services : Landscaping, Urban Gardening, Plant as Gift,Gardener Services

For all your landscaping needs, contact us at

+91 98366 11888

Address- 152, Netainagar Kalikapur, Behind Metro Cash & Carry Kolkata 700099

Follow us -

‘শুনছি — আইনের দেবীর চোখ খুলে গেছে’

— জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
সিনিয়র অ্যাডভোকেট

বিশ্বাস করুন, খুব কঠিন একটা লেখা লিখতে বসেছি। মানে আমি বলতে চাইছি, ‘বিষয়টা খুব কঠিন ও জটিল’।

ছাব্বিশ বছর ওকালতির পর, আমি কী বলতে পারি? আইনে মেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বেশী? নাকি বলতে পারি, মেয়েদের জন্য আইনের সংখ্যা বেশী? মেয়েদের জন্যই অনেক আইন? পুরুষদের জন্য আইন প্রায় নেই-ই। আইন প্রনে তারা পুরুষদের জন্য ভাবেন না। আইন প্রনেতারা শুধু মহিলাদের জন্য ভাবেন, মহিলাদের জন্য আইন প্রণয়ন করেন।

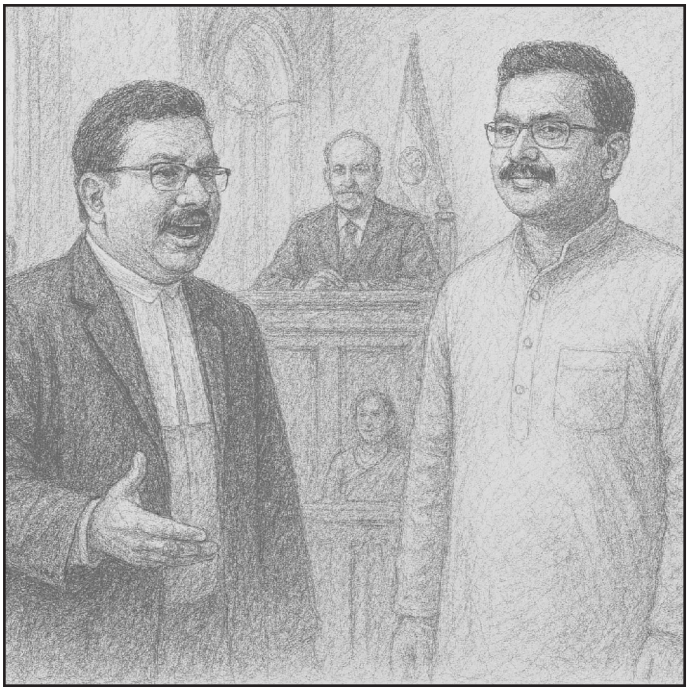

দেখুন, আমার কাছে, পুরুষেরা যেমন আসেন, মক্কেল হয়ে, তেমনি মহিলারাও আসেন। পুরুষরা আসেন যেমন, কখনো নির্যাতিত - অত্যাচারিত স্বামী হয়ে, কখনও, দিদি বোনেদের কাছ থেকে, বঞ্চিত, অপমানিত, অবহেলিত ভাই বা দাদা হিসেবে। ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে ঠোক্কর খাওয়া, অপমানিত, অবহেলিত বাবা হিসেবে। এমনকী বাবা-মা, ছেলে-ছেলের বউ-এর উপর অত্যাচার করেছেন, সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন, এমন অভিযোগ নিয়ে, বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে জমে ওঠা ক্ষোভ নিয়ে ছেলেরা ও আসেন।

পাশাপাশি, অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হয়ে পুরুষরা আসেন, রেপ বা পকসোর মিথ্যা অভিযোগ অভিযুক্ত হয়ে, অসহায় হয়ে, দিশাহারা হয়েও পুরুষরা ছুটে আসেন বাঁচতে।

কী ভাবছেন? আগের প্যারাগ্রাফে যে কথাগুলো লিখেছি, তা ভুল করে লিখেছি কিনা ভাবছেন তো? ...‘রেপ বা পকসোর মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে, অসহায় হয়ে, দিশাহারা হয়েও পুরুষরা ছুটে আসেন বাঁচতে?’

'হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন, কথাগুলো, খুব সচেতন হয়েই লিখলাম। সারা বছর যত মামলা করি, আমার বিশ্বাস, তার একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে 'মিথ্যা অভিযোগে' দায়ের হওয়া 'মিথ্যা মামলা'।

আবার, আমার, এই অবধি লেখা পড়ে, দয়া করে ধরে নেবেন না যে, মহিলারা আমার কাছে আসেন না, বা আমি বিশ্বাস করি না যে, মহিলারা আজকাল নির্যাতিতা হন না, বা অত্যাচারিতা হন না। বরং আমি বিশ্বাস করি, মহিলারা ও নির্যাতিতা হন — কখনো স্ত্রী হিসেবে, কখনো মা অথবা বোন হিসেবে ছেলে অথবা ভাই কিম্বা দাদার কাছ থেকে, আবার কখনো বা কর্মক্ষেত্রে, কখনো বা রাস্তার পথে-ঘাটে, বাসে, ট্রেনে।

হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই, আমি বিশ্বাস করি মেয়েরাও নির্যাতিতা হন। সব অভিযোগই মিথ্যা অভিযোগ হয় না। বেশির ভাগ আইন, মেয়েদের জন্য, মেয়েদের রক্ষার জন্য হলেও, বেশির ভাগ সময়েই, মেয়েরা সেই আইনগুলির সুবিধা নিতেই পারে না। কিছু দিন মামলা চালিয়েই, রনে ভঙ্গ দিয়ে, বিপরীত পক্ষের সঙ্গে রফা করে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

সংবিধানের ১৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে। রাষ্ট্র মহিলা ও শিশুদের জন্য প্রয়োজনে নতুন, আইন করতে পারবে। আর হয়েছেও তাই, শিশু ও মহিলাদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে, দেশের আইন-প্রনে তারা একের পর এক আইন প্রণয়ন করেছেন।

একটা সময় সারা দেশে, গৃহবধূদের উপর অত্যাচারের মাত্রা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশে সেইসময় বর্তমান আইনগুলি দিয়ে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের হাতে গৃহবধূদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা যাচ্ছিল না। অর্থাৎ 'এক্সিসটিং ল', স্ত্রীদের উপর ঘটে চলা নির্যাতন বন্ধে যথেষ্ট ছিল না।

তাই ঊনিশশো তিরাশি সালে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের হাতে স্ত্রীদের উপর নির্যাতন বন্ধে এল ভারতীয় দন্ডবিধিতে ৪৯৮ (ক) ধারা। ব্যক্তিগতভাবে, আমার, এই ধরনের ধারাগুলোর প্রয়োগে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু, নিজের পেশাগত জীবনে কাজ করতে মনে হয়েছে, এই ধরনের আইনগুলি ক্লিশে হয়ে যায়, আইনগুলির অপপ্রয়োগের কারণে।

৪৯৮ (ক) ধারার মূল সমস্যাও ছিল সেখানেই। মহিলারা, এই ধারার সুফল পেতে না পেতেই, অভিযোগ উঠতে থাকল, এই ধারার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের। আর তা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, সারা দেশজুড়ে। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠে গেল। সারা দেশ জুড়ে 'মিথ্যা' অভিযোগের মাত্রা এবং অভিযোগগুলির সারবত্তা নেই জেনেও, পুলিশের 'মিথ্যা' তদন্তে 'মিথ্যা' চার্জশিট জমা দেবার হার এমন জায়গায় পৌঁছায়, যে, সুপ্রিম কোর্টকেও এই ধারাটির পুনবিন্যাসের কথা ভাবতে হয়।

অবশেষে, সুপ্রীম কোর্ট অনেক চিন্তা ভাবনার পরে, সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই ধারায়, বিশেষতঃ সাত বছরের নিচে অপরাধগুলির ক্ষেত্রে, সেইসব অপরাধের, অভিযোগ গেলেই, পুলিশ তৎক্ষণাৎ অভিযুক্তকে বা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করবে না। পুলিশের উপর দায়িত্ব দেওয়া হলো, পুলিশ আগে, তদন্ত করে দেখবে, অভিযুক্তকে বা অভিযুক্তদের থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (পুরোনো ফৌজদারী কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী ৪১ (ক) ধারা অনুযায়ী, এবং বর্তমান ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা অনুযায়ী ধারা অনুযায়ী)। যদি, অভিযুক্ত বা

অভিযুক্তরা পুলিশকে তদন্তে সহযোগিতা করেন, তাহলে, তাঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করবে না, কিন্তু যদি তাঁরা পুলিশকে তদন্তে সহযোগিতা না করেন, তাহলে পুলিশ তাঁদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করে, তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ব্যস। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা আরো একবার বিপদের মুখে পড়লেন। ঐ যে বললাম, আইন প্রণেতাদের সদিচ্ছার প্রকাশ যে ধারাগুলি, সেই প্রতিটি ধারাই মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যেতে বসেছে, অপপ্রয়োগ'-র কারণে।

সুপ্রিম কোর্ট ও বিশ্বাস করলেন পুলিশকে। আর এই মুহূর্তে, ভারতীয় দন্ড বিধিতে ৪৯৮ (ক) ধারা বা বর্তমান ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ধারাটি তার যাবতীয় নখ-দাঁত হারিয়েছে, স্রেফ পুলিশের সৎ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্ত না করার কারণে।

একইভাবে, শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেবার জন্য 'প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট, সংরক্ষণ পকসো হয়। এই আইনটিও বধূ নির্যাতন বিরোধী আইনটির মতোই, অত্যধিক অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের ফলে নষ্ট হতে বসেছে অভিযোগ উঠছে, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, সীমানা প্রণীত সংক্রান্ত ঝামেলাতেও, বা জমি-জমা সংস্ত্রান্ত বিবাদেও একপক্ষ, আর এক পক্ষের বিরুদ্ধেও পক্সো আইনে মামলা রুজু করে। আর তা যদি একটি মামলা অপব্যবহারের নিদর্শন হয়, তাহলে পুলিশ করছে অপপ্রয়োগ।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠছে, পুলিশ, সব জেনেশুনে, মিথ্যে মামলা সাজাচ্ছে, মিথ্যে বয়ান তৈরী করছে। মিথ্যে চার্জশীট জমা দিচ্ছে। এমনকী বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন মিথ্যে সাক্ষী যোগাড় করে আনছে।

আইন প্রনেতারা, আইনে এত সংশোধন, পরিমার্জন করছেন, তবু, তদন্তের ক্ষেত্রে 'পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানে' আজো বিশ্বাস করছেন। আদালতগুলিও তাই সবাই জানে, যেহেতু পুরোনো ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারানুযায়ী, (বর্তমান আইনের অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ধারানুযায়ী পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানে, যিনি বয়ান দিচ্ছেন, তাঁর সই প্রয়োজন হয় না, সেইহেতু, পুলিশ, নিজের টেবিলে বসে ইচ্ছেমতো গল্প সাজাতে পারে। সেই অনুযায়ী, অভিযোগ ওঠে যে, 'বাজারদর' অনুযায়ী কেস সাজানো হয়। একই অভিযোগ ওঠে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১ (ক) ধারা (বর্তমান ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ধারা) অনুযায়ী, নাকি অভিযুক্তের পকেটের ভার বুঝে কেস সাজানো হয়।

কী আশ্চর্য, যে ব্রিটিশরাও, তাদের শাসনকালে পুলিশকে বিশ্বাস করেনি, আমরা আজো তাদের বিশ্বাস করি পুলিশের বিরুদ্ধে আজকাল বলা হচ্ছে, তারা নাকি, যে কোনো নামী গল্পকারের চাইতেও ভালো গল্প সাজাতে পারে। তবে, তা সবটাই নাকি 'বাজারদর' অনুযায়ী।

আমি বুঝতে পারি না, একটা অভিযোগ দায়ের হবার (তা সে যে কোনো ধারাতেই হোক না কেন), পুলিশ কেন নিরপেক্ষ, সৎ ও সুষ্ঠু তদন্ত করবে না? কেন তারা বলতে সাহস পাবে না, যে, 'আমরা তদন্ত করে দেখেছি, এই অভিযোগের কোনো সারবত্তা নেই, আমরা তদন্ত আর চালাবো না'। উল্টে, পুলিশ, মিথ্যে

অভিযোগ জেনেও, 'বাজারদর' অনুযায়ী কেস সাজায়, এই অভিযোগ উঠছে। যেখানে, চার্জশীট হওয়া উচিত নয়, সেখানে, চার্জশীট জমা দিয়ে দিচ্ছে পুলিশ, বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনে মিথ্যে সাক্ষ্য যোগাড় করছে।

শেষ করব, এই বলে, মাননীয় আদালত কী বুঝতে পারছেন না, যে, আগাগোড়া 'মিথ্যে'য় ভরা একটা মামলা তাঁর আদালতে চলছে? তবু নাকি আদালতের কিছুই করার থাকে না। বলা হয়, আদালত চলে সাক্ষ্যের বলে, আইনের হাত বাঁধা।

কিন্তু, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, আইনের দেবীর চোখের পট্টি খুলে দিয়েছেন এখন থেকে আইনের দেবী, 'সবকিছু' দেখতে পাবেন কী?

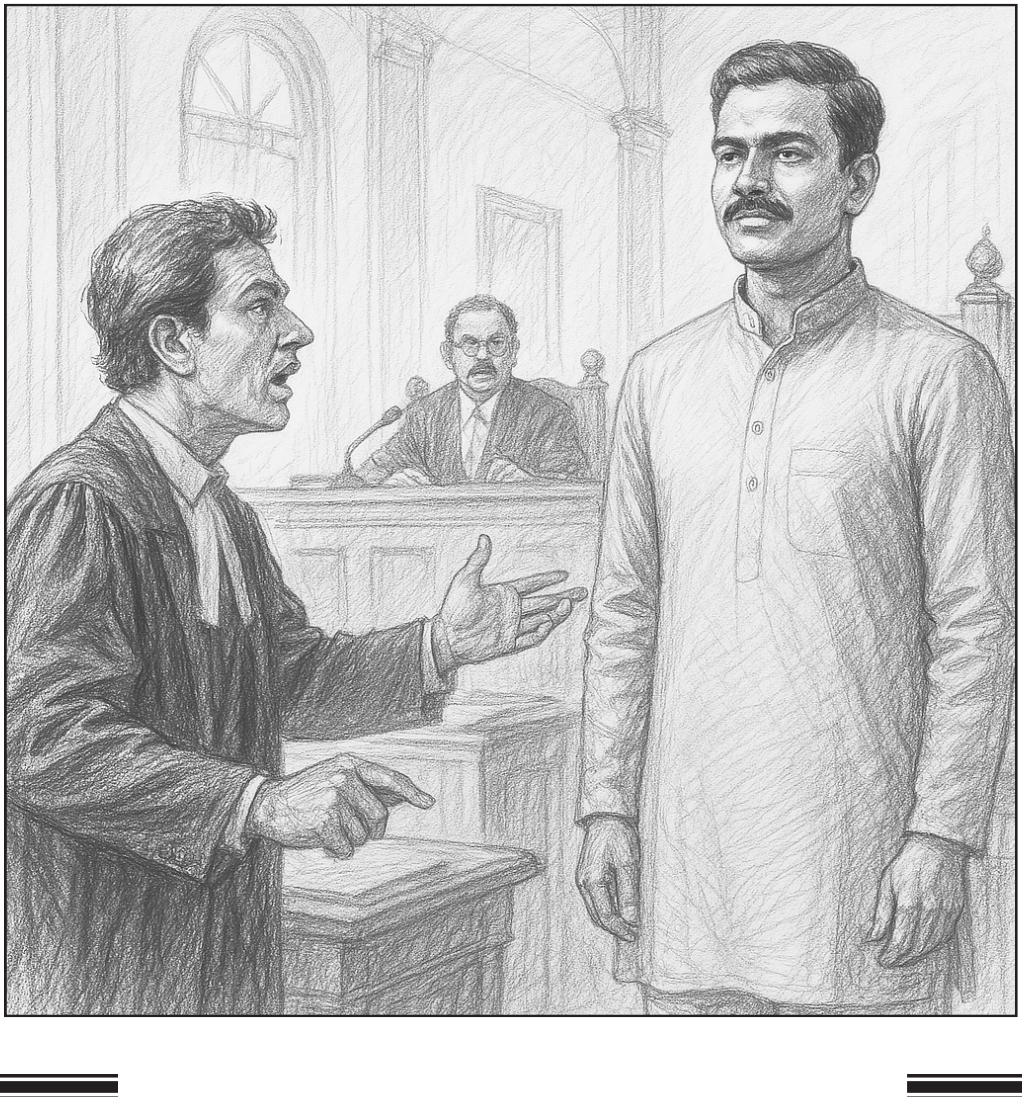

আর্থিক অনিশ্চয়তা রুখতে চাই সঠিক পরিকল্পনা

— অমিতাভ গুহ সরকার
অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ

কয়েক দশক আগেও এমন একটা সময় ছিল যখন অনেকেই যে সংস্থায় কাজে কাজে ঢুকতেন সেখান থেকেই অবসর নিতেন। বিশেষ করে সরকারি দফতর এবং নামী সংস্থার ক্ষেত্রে নিয়মটা এইরকমই ছিল। একে পাকা চাকরি (পার্মানেন্ট) বলা হত। বিয়ের বাজারে বিশেষ কদর ছিল পাকা চাকুরেদের। খোদ সরকারি দফতরে তো বটেই, সরকারি ব্যাঙ্ক, রেল, ডাকঘর ইত্যাদি জায়গায় কয়েক লক্ষ মানুষ কর্মজীবনের প্রায় পুরোটাই কাটিয়ে দিতেন। অনেকটা একই রকম চিত্র ছিল বড় এবং নামী দেশি এবং বিদেশী সংস্থাতেও। গত দু দশকে এই চিত্রটি কিন্তু আমূল পাল্টে গিয়েছে। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা এবং অনিশ্চয়তার কারণে দ্রুত কমছে পাকা চাকরির সংখ্যা। বিশ্বায়নের ভাল এবং মন্দ দুই প্রভাবই এখন ভারতে বেশ স্পষ্ট। 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' কথাটির সঙ্গে আমাদের তরুণ সমাজ এখন যথেষ্ট পরিচিত। তাঁরা এটা ভাল রকম বুঝেছে চাকরি ততদিনই থাকবে যতদিন সংস্থায় তাঁর প্রয়োজন থাকবে। আপনি যত প্রিয় পাত্র হোন না কেন প্রয়োজন ফুরোলে আপনাকে দরজা দেখিয়ে দিতে কেউ দ্বিধা করবে না। এখানে মায়া, মমতা, আবেগ এসবের কোনও স্থান নেই। এটাই হল কঠিন বাস্তব। আপনি কোম্পানির ঘরে লাভ আনুন কোম্পানি আপনাকে খাতির করবে। যখন তা বন্ধ হবে তখন বুঝতে হবে আপনার বিসর্জন আসন্ন। তাছাড়া এখনকার তরুণ পরিচালকেরা বেশি বয়সের কর্মী রাখতে চাইছে না। এঁদের যুক্তি বেশিদিন চাকরির সুবাদে একদিকে যেমন তাঁদের মাইনে অনেকটা বেড়ে যায় অন্যদিকে তেমন তাঁরা শ্লথ হয়ে পড়েন এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারেন না। অর্থাৎ বেশ কিছু বছর চাকরি করার পরও আপনার চাকরি সুরক্ষিত একথা বলা যাবে না। এইসব কারণে এখন অনেক চাকরিই চুক্তি ভিত্তিক হয়। অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী তোমাকে তিন বছরের জন্যে নেওয়া হল। চুক্তি শেষে প্রয়োজন হলে চুক্তির নবীকরণ করা হবে। অন্যথায় তোমাকে বিদায় জানানো হবে। অর্থাৎ (নিয়োগ) কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম এবং তার ইচ্ছাতেই কর্মহীনতা কিম্বা অকাল অবসর।

নিয়োগের যেমন প্রথা পাল্টেছে তেমন কৌশল পাল্টাচ্ছে দক্ষ কর্মীরাও। এঁরা এক সংস্থায় দীর্ঘকাল সেঁটে থাকতে চাইছেন না। ভাল সুযোগ পেলে দ্বিধা করছেন না কোম্পানি পাল্টাতে। লক্ষ্য দ্রুত ওপরে ওঠা। যত দ্রুত মোটা টাকা কামিয়ে নেওয়া যায়। চাকরির মত অনিশ্চয়তা আছে ব্যবসার ক্ষেত্রেও। যে ব্যবসা আজ ভাল কাল তা নাও থাকতে পারে।প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে অনেক ভাল ব্যবসা হঠাৎই হারিয়ে যায়। গভীর সমস্যায় পড়েন ব্যবসার মালিক। ভাল রকম অনিশ্চয়তা থাকে মরশুমি ব্যবসাতেও।

চাকরির বাজারে যে বড় রকমের দুর্যোগ আসন্ন তা একরকম সবাই জেনে গিয়েছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার করালগ্রাসে যে বহু চাকরি হারিয়ে যেতে চলেছে তা স্বীকার করছেন বিশেষজ্ঞরাও। একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় দেশে যতজন চাকরী করেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪১ শতাংশের চাকরি সুরক্ষিত। এরা মূলত যাঁরা কায়িক শ্রম করেন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পেশার সঙ্গে যুক্ত। বাকীদের অনেকেই খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে। নতুন তথ্যপ্রযুক্তির জমানায় এঁদের দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। নতুন প্রযুক্তির পাঠ নিতে হবে অতি দ্রুত। না

পারলে বেকারদের মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে। মোটা আয় করেন এমন মানুষকেও হঠাৎ বসে যেতে হতে পারে।

অর্থাৎ আগামী দিনে চাকরি হারানোর ভয় থাকবে চাকরিজীবীদের একটি বড় অংশের। একটি চাকরি হারানোর পর মনের মত আরেকটি চাকরি পেতে হয়ত অনেকটা সময় কেটে যাবে। অনেককে সময় দিতে হবে নতুন প্রযুক্তির পাঠ নিয়ে দক্ষ হয়ে ওঠার জন্যে। অর্থাৎ মধ্যের এই সময়ে কোনও আয় থাকবে না। আবশ্যিক খরচগুলি কিন্তু থেকেই যাবে। বিশেষ করে যাঁদের ভাড়া বাড়িতে থাকতে হয় অথবা মাস গেলে ফ্ল্যাট বা গাড়ির ই এম আই ভরতে হয়। এছাড়া অনেকেরই থাকবে সন্তানের পড়ার খরচ এবং মাঝে মধ্যে সামলাতে হবে অসুখ বিসুখ। সুতরাং আর দেরী না করে এখন থেকেই ধরে নিতে হবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এসে গিয়েছে। তার মোকাবিলায় মাঠে নেমে পড়তে হবে এক্ষুনি।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্যে পিঁপড়ের মত তিল তিল করে রসদ সংগ্রহ করতে হবে। যতক্ষণ না একটি ভাল মাপের ভান্ডার তৈরি হচ্ছে ততদিন বাজে খরচ একদম করা যাবে না। যাঁরা চাকরি অথবা পেশায় নতুন অথবা কিছুদিন আগে প্রবেশ করেছেন তাঁদের যত দ্রুত সম্ভব পরিকল্পনা মাফিক সঞ্চয়ের পথে নেমে পড়তে হবে। যাঁরা মাঝ বয়সে পৌঁছেছেন তাঁদের ‘ওয়র চেস্ট’ তৈরি না হয়ে থাকলে তাঁদেরও দ্রুত সুরক্ষার ভান্ডার তৈরিতে মন দিতে হবে। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে থাকলে অবসরের জন্যে পরিকল্পনা রচনা করে সেই মাফিক এগোতে হবে। প্রশ্ন হল ভান্ডারের আকার কি হবে। প্রথম লক্ষ্য হবে তিন থেকে ছ'মাসের রসদ জোগার করা এবং পরে তা বাড়ানো। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরা যাক আপনার মাসিক আয় ৮০ হাজার টাকা এবং সব মিলিয়ে খরচ ৬০ হাজার টাকা। তিন মাসের খরচ হাতে রাখতে হলে আপনাকে জমাতে হবে ১.৮০ লক্ষ টাকা। আপনি যদি মাসে ১০ হাজার করে জমাতে শুরু করেন তবে দেড় বছরে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। একই হারে জমিয়ে তিন বছরে গড়া যেতে পারে ছ'মাসের রসদ। এই ভান্ডার তৈরি হয়ে গেলেই থেমে গেলে চলবে না। তাকে বাড়িয়ে যেতে হবে। কারণ জিনিষের দাম বাড়বে, বাড়বে খরচের বহরও। তা ছাড়া বড় মেয়াদে সম্পদ সৃষ্টির কথাওতো ভাবতে হবে। ভাবতে হবে অবসর পরবর্তী জীবনের কথাও।

কাজটাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে এবারের বাজেট। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্যে মধ্যবিত্ত পেয়েছে একটি স্বপ্নের বাজেট। নতুন কর কাঠামোতে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কারীদের কোনও কর দিতে হবে না। এছাড়া ২৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে করের স্তর বেড়েছে এবং করের হার কমেছে। এই দুইয়ে মিলে করদাতাদের সাশ্রয় হবে ৩০ হাজার টাকা থেকে ১.১০ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বাবদ ৪% কর ধরলে সাশ্রয়ের মাত্রা আরও অনেকটাই বাড়বে। অর্থাৎ মাসে সাশ্রয় হতে পারে কমবেশি ৩০০০ টাকা থেকে ১১,০০০ টাকা। নতুন কর কাঠামোকে এবার এতটাই আকর্ষণীয় করা হয়েছে যে বেশিরভাগ করদাতাই সম্ভবত পুরোনো কাঠামো থেকে নতুনে পাড়ি দেবেন। সেক্ষেত্রে ৮০সি ধারায় কর বাঁচানোর জন্যে তাঁদের আর ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তহবিল কর সাশ্রয়কারী প্রকল্পে লগ্নি করতে হবে না। অর্থাৎ এপ্রিল থেকে তাঁদের হাতে থাকবে বেশ ভাল পরিমান অতিরিক্ত নগদ। এই বাড়তি টাকার একটা বড় অংশ নিয়মিত লগ্নি করে গেলেই প্রয়োজনীয় অর্থ ভান্ডার গড়ে উঠবে। বাজারে প্রচলিত রিটার্ণ অনুযায়ী এই

তহবিল সুদে মূলে বাড়তেও থাকবে। এই পথে অল্প সময়ের মধ্যেই মজবুত হতে পারে আর্থিক সুরক্ষার দিকটি।

এখন প্রশ্ন হল টাকা কোথায় জমাবেন। আপৎকালীন ভান্ডার এমন জায়গায় রাখতে হবে যা প্রয়োজনে অতি সহজে ভাঙ্গানো যায়। যাঁরা মিউচুয়াল ফান্ড জগতের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা নিয়মিত টাকা জমাতে পারেন লিকুইড অথবা আল্ট্রা শর্ট টার্ম ফান্ডে। এখান থেকে টাকা অতি সহজে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোলা যায়। এখন রিটার্ণ পাওয়া যাচ্ছে ৭ শতাংশের আশপাশে যেখানে ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্টে সুদ পাওয়া যায় কমবেশি মাত্র ৩ শতাংশ। যাঁরা ফান্ডে টাকা রাখতে স্বচ্ছন্দ নন তাঁরা ব্যাঙ্কে রেকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে তাতে নিয়মিত টাকা জমাতে পারেন। এইভাবে প্রাথমিক ভান্ডার তৈরি হয়ে গেলে তা ব্যাঙ্কের লিকুই ফিক্সড বা লিঙ্কড অ্যাকাউন্টে রাখতে পারেন। এই ধরণের অ্যাকাউন্ট একই সঙ্গে লিকুইড এবং ফিক্সড। অর্থাৎ একই সঙ্গে সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিটের সুবিধা পাওয়া যায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের মতই চেক কেটে চটজলদি টাকা তোলা যায়। অন্যদিকে যতদিন টাকা তোলা না হবে ততদিন তার উপর সুদ পাওয়া যাবে ফিক্সড ডিপোজিটের হারে।

যতদিন না আপৎকালীন ভান্ডার গড়ে উঠছে ততদিন পর্যন্ত কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হবে এবং তা হল -

অনাবশ্যক খরচ এড়িয়ে চলতে হবে।

মাসিক জমায় যেন কোনও ছেদ না পড়ে।

জমা টাকা মাঝপথে তোলা যাবে না।

কোনও সূত্র থেকে আকস্মিক কোনও অতিরিক্ত আয় হলে তার একটি বড় অংশ জমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

যাঁদের আয় ও ব্যয় মোটামুটি সমান অথবা আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি তাঁদের অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজতে হবে। যেমন বাড়ির একাংশ ভাড়া দেওয়া যায় কিনা। পেশাগত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে কোনও অতিরিক্ত উপার্জন করা যায় কিনা। পরিবারের অন্য কেউ কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা ইত্যাদি।

প্রথমে ১৮ মাস এবং পরের ৩৬ মাসে আপৎকালীন তহবিল গড়া হয়ে গেলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তবে এখানে থেমে গেলে চলবে না। নিয়মিত জমা এবং লগ্নি জারি রাখতে হবে। তবে তার পরিকল্পনাটা হবে একটু অন্যরকম। লক্ষ্য হবে সম্পদ গড়ে তোলা। যাঁরা সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরি করেন না অথবা ব্যবসা কিম্বা স্বাধীন পেশায় নিযুক্ত তাঁরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি এবং পেনশনের মত সুবিধে থেকে বঞ্চিত। পরের ধাপে এঁদের চেষ্টা করতে হবে যাতে নিজেরাই নিজেদের পি এফ এবং পেনশনের ব্যবস্থা করা যায়।

পি এফ এর ব্যবস্থা করার জন্যে একটি পি পি এফ অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলতে হবে। ১৫ বছর মেয়াদি

এই অ্যাকাউন্টে বছরে ন্যূনতম ৫০০ টাকা এবং সর্বাধিক ১.৫ লক্ষ টাকা জমা করা যায়। এই অ্যাকাউন্টে বর্তমানে ৭.১% সুদ পাওয়া যাচ্ছে যা পুরোপুরি করমুক্ত। প্রাথমিক মেয়াদ শেষ হলে এই অ্যাকাউন্টের মেয়াদ ৫ বছর করে বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এইভাবে লম্বা মেয়াদে টানা জমিয়ে গেলে সুদে আসলে এই অ্যাকাউন্ট একটি বড় তহবিল গড়ে দিকে পারে যা হবে পুরোপুরি করমুক্ত। ডাকঘর এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বড় শাখায় খোলা যায় পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যাকাউন্ট। যাঁরা সংস্থাগত পি এফের সুবিধা পান তাঁরাও পি পি এফ অ্যাকাউন্ট খুলে লম্বা মেয়াদে বড় তহবিল গড়ে নিতে পারেন।

পরের পদক্ষেপ হল নিজের পেনশন তহবিল গড়ে তোলা। এর জন্যে সবথেকে সহজ এবং সুরক্ষিত উপায় হল মাত্র ১০০০ টাকা জমা করে একটি এন পি এস অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলা। ন্যাশনাল পেনশন সিস্টেম হল সরকারি উদ্যোগে গড়া একটি পেনশন প্রকল্প। প্রথমে এটি শুধুমাত্র সরকারী কর্মীদের জন্যে করা হলেও পরে বেসরকারি ক্ষেত্রের মানুষকেও যোগদান করার সুযোগ দেওয়া হয়। বছরে কমপক্ষে মাত্র ১০০০ টাকা জমা করতে হয়। এরপর সামর্থ্য অনুযায়ী বড় তহবিল গড়ার লক্ষ্যে জমার অঙ্ক বাড়াতে হয়। যোগদান করার জন্যে বয়সের উর্ধসীমা বাড়িয়ে ৭০ বছর করা হয়েছে। গ্রাহকের পছন্দ অনুযায়ী এই তহবিলের একাংশ শেয়ার বাজারে খাটানো হয়। বাজারের সুদিনে এই অ্যাকাউন্টে কম বেশি ১৫% রিটার্ণ দেখিয়েছে। এইভাবে দীর্ঘমেয়াদে নিয়মিত জমা ক্রমপুঞ্জিত হারে বেড়ে একটি বড় তহবিল গড়ে দেয়। মেয়াদ শেষে জমার ৬০% পর্যন্ত তুলে নেওয়া যায়। বাকি ৪০% দিয়ে অ্যানুয়িটি কেনা হয় যা থেকে গ্রাহক নিয়মিত পেনশন পেতে শুরু করেন। আকর্ষনীয় করের সুবিধাও আছে এই প্রকল্পে।যাঁদের সংস্থাগত পেনশনের সুবিধা আছে তাঁরাও এই প্রকল্পে যোগদান করতে পারেন। পি এফ আর ডি এ দ্বারা এই ফান্ড নিয়ন্ত্রিত। সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী এন পি এস প্রকল্পে বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ৮.২ কোটি এবং তহবিলের পরিমান ১৪ লক্ষ কোটি টাকা। এদের মধ্যে বেসরকারি ক্ষেত্রের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬৫ লক্ষ এবং তাঁদের তহবিলের আকার ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা।

আপৎকালীন তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পেনশন তহবিল গড়ার জন্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার পর একটু বড় মেয়াদে সম্পদ সৃষ্টির কথা ভাবতে হবে। বাড়ি, গাড়ি, সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি ইচ্ছে পূরণের কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় তহবিল গড়ার কাজে মন দিতে হবে। অতীতে বেশিরভাগ মানুষ ব্যাঙ্ক এবং ডাকঘরেই টাকা জমাতেন। পরে চড়া দামের বাজারে মানুষ বুঝল এই দু জায়গায় টাকা রাখে তেমন লাভজনক নয়। প্রথমত এখানে সুদের হার তেমন আকর্ষণীয় নয় এবং দ্বিতীয়ত তার উপর করের থাবা বসলে প্রকৃত আয় বেশ খানিকটা কমে যায়। যা থাকে তা অনেক সময়ে মূল্যবৃদ্ধির হারের তুলনায়ও কম। এই কারণে বেশ কয়েক বছর হল মানুষ শেয়ার, বন্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে ঝুঁকেছে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিতে ভাল রিটার্নের সন্ধান করেন তাঁদের জন্যে একটু বড় মেয়াদে মিউচুয়াল ফান্ড হল টাকা জমানোর আদর্শ জায়গা।

ইক্যুইটি ফান্ড রিটার্ণের দিক থেকে বেশ ভাল। এখানে একলপ্তে টাকা না জমিয়ে মাসে মাসে ছোট আকারে টাকা জমা করে দীর্ঘ মেয়াদে বড় তহবিল গড়ে তোলা যায়। ফান্ডের দুনিয়ায় এর নাম সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এস আই পি।এই পথে মাসে বিপুল পরিমান টাকা জমা পড়ে যার একটি বড় অংশ

শেয়ার বাজারে নথিবদ্ধ বিভিন্ন শেয়ারে লগ্নি করা হয়। বড় মেয়াদে রিটার্ণও ভাল পাওয়া যায়। সঠিক সুবিন্যস্ত ফান্ডে বড় মেয়াদে টানা লগ্নি করে গেলে ১৫% বা তারও বেশি রিটার্ণ পাওয়া বিরল নয়। এইভাবে লম্বা মেয়াদে বেশ বড় তহবিল গড়ে উঠতে পারে। যেমন দশ বছর ধরে প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা করে লগ্নি করে গেলে মেয়াদ শেষে ৬ লক্ষ টাকার মূল লগ্নির উপর ১৫% রিটার্ণ সহকারে ঘরে আসতে পারে ১৩,১৫,০৯০ টাকা। একইভাবে ২০ বছর ধরে জমিয়ে গেলে ১২ লক্ষ টাকার লগ্নি বেড়ে হতে পারে ৬৬,৩৫,৩৭০ টাকা। ঝুঁকি কম রাখার জন্যে লগ্নি করা যেতে পারে ব্যালান্সড তথা হাইব্রিড ফান্ডে। বিভিন্ন খাতে প্রয়োজন মেটাতে একাধিক এস আই পি অ্যাকাউন্ট খোলা যেতে পরে। মাসে মাসে যেমন জমানো যায় তেমন জমে ওঠা টাকা মাসে মাসে তোলাও যায় যার পোষাকি নাম সিস্টেমেটিক উইথড্রয়াল প্ল্যান বা এস ডাব্লু পি। বড় মেয়াদে মোটা টাকা জমিয়ে এই পথে মাসিক পেনশনের ব্যবস্থা করা যায়।

বিভিন্ন তহবিল গড়ার পাশাপাশি বিমার দিকেও নজর দিতে হবে। বড় মাপের গৃহ ঋণ থাকলে সমপরিমান টাকার জীবন বিমা থাকা বান্ছনীয়। থাকতে হবে উপযুক্ত অঙ্কের স্বাস্থ্য বিমাও। যাঁরা বাড়ির বাইরে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন তাঁদের ফি বছর করাতে হবে দুর্ঘটনা বিমা। যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য কম তাঁরা বিভিন্ন সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম লেখাতে পারেন। যেমন অটল পেনশন যোজনা, স্বাস্থ্যসাথী, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা ইত্যাদি। মোদ্দা কথা হল বাজারে প্রচলিত সব সুযোগ সুবিধে নিয়ে নিজের আখের নিজেকেই গুছিয়ে নিতে হবে। এতে জীবন হবে অনেক সচ্ছল। আর্থিক বিপদে দিশেহারা হতে হবে না। এসবের জন্যে বিরাট আয় থাকতে হবে তা নয়। আর্থিক শৃঙ্খলা থাকলে পরিকল্পনা মাফিক অল্প আয় নিয়েও মানুষ দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

‘ষাট’ এ হোন আরও স্মার্ট

— ডাঃ ধীরেশ কুমার চৌধুরী

বার্ধক্য চিকিৎসক, সমাজকর্মী, ‘বাঁচবো’ র কর্ণধার এবং
জেরিয়াট্রিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া পঃবঃ শাখার কোষাধ্যক্ষ
এবং অল বেঙ্গল মেন্স ফোরাম এর উপদেষ্টা।

ঠিকই ৭৮+, ৭৪+, ৭২+, ৭১+, ৬৮+ সংখ্যা গুলো দেখে নিশ্চিত বুঝতে পারছেন যে এগুলো কিছু মানুষের বয়সকে বোঝাচ্ছে। ঠিকই ধরেছেন আপনি। এই বয়সগুলো হচ্ছে অত্যন্ত শক্তিশালী পাঁচটি দেশ যাদের বলা চলে বর্তমান বিশ্বের চালিকা শক্তি তাদের রাষ্ট্র প্রধানদের বর্তমান বয়স। যাঁরা হলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ৭৮+, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭৪+, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ৭২+, চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং ৭১+ আর জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা ৬৮+। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এনারা প্রত্যেকেই কিন্তু পুরুষ। এর পরেও কি বয়স ষাট পেরিয়েছে এই নিয়ে আপনি ভাববেন? ভাববেন অবসর হয়ে গেলো এবার তাহলে কি করবেন? নাকি ওনাদের দেখে বয়সের কথাটাকে মাথা থেকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। ষাট পেরিয়েছে, কর্মস্থল থেকে অবসর নিয়েছেন তাতে কি! মনে রাখবেন অবসর আপনার কর্মস্থল থেকে, আপনার জীবন থেকে নয়। বরং আপনার এই সময়টা হল জীবনের সেরা সময় ‘দ্বিতীয় শৈশব’। অবসরের ভাবনা তো নয়ই বরং নতুন উদ্যমে আবারও কাজে যুক্ত হবার সময়। এ কাজ চাকরীর সময়কালের কাজের মতন চাপের নয়, বরং আনন্দের (তার মানে কিন্তু এই নয় যে চাকরীর সময়টাকে আমি নিরানন্দের বলছি), অনেক প্রাণ খুলে কাজ করার সময়। নিজের অপূর্ণ অনেক ইচ্ছা বা শখ যা ব্যস্ততার কারনে করে ওঠা সম্ভব হয়নি এতদিনে সেটাকে বিকশিত বা explore করার সময়। মনে রাখবেন এতদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কিন্তু আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেটা কিন্তু সমাজ এমনকি দেশেরও সম্পদ। আর এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে আপনাকে। এখনতো অনেক জায়গায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় অবসরের পরে তাঁদের কে পরামর্শদাতা বা consultant হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের চেনা বহু চিকিৎসক আছেন যাঁরা সরকারী মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার পর অবসর নিয়ে আবার বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অধ্যাপনা করছেন। আমার জান্য একাধিক প্রবীণ মানুষ এখনও কাজ করছেন বিভিন্ন জায়গায়। আমাদের সংস্থা ‘বাঁচবো’ তেও কিন্তু বেশ কয়েক জন প্রবীণ রয়েছেন যাঁরা দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করছেন। আমেরিকায় এক গবেষণায় প্রবীণদের জন্য উৎসাহ জনক এক তথ্য বলছে নবীন কর্মীদের অপেক্ষা সংস্থায় অবসর পরবর্তী পুনর্বাসন প্রাপ্ত প্রবীণদের কাজের দক্ষতা, মান, দায়িত্ববোধ অনেক বেশ নেক পরবর্তী তৎপ বেশী। তাই অবসর মানেহ আপনার সব শেষ এ ভাবনাটাই অমূলক। আর তাই অবসরকে সাদরে গ্রহণ করে সময় কে সার্বিক অর্থে সুন্দর ও সৃজনশীল এবং আনন্দময় করে তুলতে অবসর গ্রহণের ২/৩ বছর আগে কিন্তু আপনাকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। যাতে জীবনে অবসর পরবর্তী কখনোই আপনার শূন্যতা বোধ না আসে। বরং আপনার কাছে এই সময়টা হয়ে ওঠে আনন্দদায়ক এবং উপভোগ্য। আর ‘ষাট’ এ হয়ে উঠুন আরও স্মার্ট।

১০ টি উপায় যা আপনাকে উপভোগ্য অবসর জীবন উপহার দিতে পারেঃ

১. জীবন থেকে অপ্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলিকে বাদ দিন। যেমন বয়স, ওজন, প্রেসার, সুগার, কোলেস্টেরল ইত্যাদি। এগুলোকে নিয়ে ডাক্তার কে ভাবতে দিন, আপনি অযথা ভেবে উদ্বিগ্ন হবেন না।

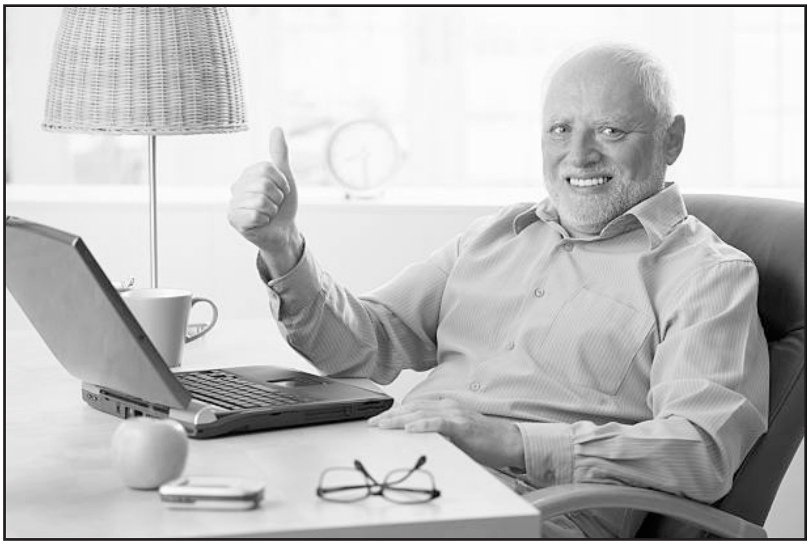

২. শিখতে থাকুন। নতুন নতুন জিনিস থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। কম্পিউটার, ফেসবুক, ওয়াটস্ অ্যাপ করতে জানুন। বর্তমান যান্ত্রিক উন্নতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। মনে করবেন না এগুলো সবই খারাপ। এতে নিজেই পিছিয়ে থাকবেন। বরং জানা থাকলে এসবের থেকে অনেক কিছু তথ্য আহরণ করতে পারবেন, সমকালীন হতে পারবেন, আপডেটেড থাকতে পারবেন। ফলে বহু সম মানসিকতার মানুষের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। আপনার মস্তিষ্ককে অলস হতে দেবেন না। মনে রাখবেন অলস মস্তিষ্ক কিন্তু ডিমেনসিয়া বা অ্যালজাইমার রোগদের আমন্ত্রণ জানায়।

৩. প্রাণোচ্ছল বন্ধুদের সাথেই মিশুন। যাঁরা এধরনের নয় প্রথমে চেষ্টা করুন তাঁদেরকে একই ভাবে উৎসাহিত করতে। না হলে তাঁদের থেকে দূরে থাকুন। অযথা বাকবিতণ্ডায় জড়াবেন না, ওঁনাদের সাথে, এতে আপনিই অযথা উত্তেজিত হবেন। বন্ধুদের মধ্যে আলোচনায় অসুখ বিসুখকে দূরে রাখুন।

৪. সহজ জিনিসের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে নিন। আনন্দ পেতে মহার্ঘ্য বা দুর্লভ জিনিসের প্রয়োজন হয়না। নাতির সাথে ক্রিকেট খেলে, নাতনিকে গল্প বলে, আনমনে গান গেয়েও আনন্দ পাওয়া যায়।

৫. হাসুন। প্রাণ খুলে, জোরে, নিঃসংকোচে। অন্যকেও হাসান। আনন্দ দিয়ে, সাথে থেকে, পাশে থেকে। কারোর কাজে লেগে সে আপনার এলাকার প্রান্তিক শিশুদেরকে পড়িয়ে কিংবা আপনার সমবয়সী বা বেশী বয়সের অসুস্থ গৃহে আবদ্ধ কোনো বন্ধু বা আত্মীয়কে দেখতে গিয়ে তাদের মুখে যে হাসি দেখবেন, তার থেকে বেশী তৃপ্তি আর কিছুতে পাবেন না।

৬. নিজের ভালো লাগা জিনিসের দ্বারা আবৃত রাখুন নিজেকে। সেটা যেমন আপনার পরিবার হতে পারে, তেমনই আপনার পোষ্য জন্তু, গান, শখ, বাগান, বই যেকোনো কিছুই হতে পারে। কোনো শখ বা ইচ্ছা যা পূরণ হয়ে ওঠেনি এতদিন সেগুলো কে আবারও করে উঠতে পারেন। প্রয়োজনে শেখাও শুরু করতে

পারেন যেমন গান, আবৃত্তি, আঁকা শেখা। অন্যের জন্য নয় বরং নিজের ভালো লাগার জন্য কবিতা, গল্প, ভ্রমণকাহিনী লিখুন। কথায় তো আছে শেখার কোনো বয়স নেই।

৭. নিজের স্বাস্থ্যকে উপভোগ করুন। যদি সুস্থ থাকেন তাকে রক্ষা করুন, যদি বেঠিক হয় তাহলে সচেতন হয়ে ঠিক করার প্রয়াসী হোন, যদি আয়ত্তের বাইরে হয় চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। কখনোই উন্নাসিক হবেন না বা অবহেলা করবেন না। অপেশাদার মানুষের কথা শুনে, গুগুল ঘেঁটে, নিজের অজানা জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে নিজের শরীরকে অযাচিত সংকটে ফেলবেন না। শারীরিক মানসিক ক্ষতির সাথে মনে রাখবেন অর্থকরী ক্ষতিরও সম্মুখীন হবেন যা কখনোই কাম্য নয়।

৮. সামাজিক হোন। নিজেকে দূরে না সরিয়ে বা বোকাবাক্সের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বরং পারিবারিক, সামাজিক অনুষ্ঠান, মিলন প্রভৃতিতে নিজেকে আরও বেশী করে যুক্ত করুন। প্রয়োজনে সংগঠকের দায়িত্ব নিন। যেমন পাড়ার দুর্গোপুজোতে কি নিদেন পক্ষে কোনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজক হিসেবে বা পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্ব ভার নিয়ে।

৯. ধূমপান বা মদ্যপান নয় বরং ভ্রমণে আসক্ত হোন। এর থেকে সুস্থ ও সুন্দর নেশা আর কিছুই নেই। এতে যেমন মন ভালো থাকে, তেমনি মন প্রসারিত হয়, অজানাকে জানা যায়, অনেক negative পরিস্থিতি থেকে দূরে সরে থাকা যায় আর বহুদিন এই সুখ স্মৃতিতে নিজেকে ভালো রাখা যায়।

১০. সাম্মানিক বা কিছু পারিশ্রমিক পেলে ভালো কিন্তু না পেলেও যদি বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার সুযোগ কোথাও থাকে যেমন কোনো NGO কিংবা কোনো সংস্থা, স্কুল তাহলে নিজেকে যুক্ত করুন। দেখবেন এতে আনন্দ তো পাবেনই একটা দায়িত্ববোধ থাকবে, কাজের স্বীকৃতি বা প্রাপ্তি আপনাকে আরও কাজে উৎসাহিত করবে। অবসাদ কখনোই আপনার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। পরবর্তী প্রজন্মের সাথে মেশার সুযোগ পাবেন। এতে সমৃদ্ধ হবেন দুপক্ষই। আপনার মনও অনেক জটিলতা মুক্ত স্বচ্ছ ও সরল হবে।

উপভোগ্য অবসর জীবনের আসল নির্যাস লুকিয়ে আছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তেরো তম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দর "Way to Attain Bliss in Old Age" বইটিতে উল্লেখিত সুন্দর এই উদ্ধৃতির মধ্যে "Forenoon of the life has one objective. Afternoon of life has another objective. Donót carry the forenoon into the afternoon. By the word 'Forenoon' is meant how to get established in the world– earn money– raise a family– enjoy the delights of life and get a good name in the society. That's called 'forenoon'. Now don't carry this into the afternoon (old age), otherwise there will be a great diminution of personality and want of inner qualitative enrichment."

নিজের জীবনের দ্বিতীয় শৈশবকে উপভোগ্য ও কর্মমুখী করে তোলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের সকলের প্রিয় কবি রবির কথাতেও তাই একই ভাবধারার প্রতিচ্ছবি ‘‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরও আরও দাও প্রাণ...’’।

ভালো থাকুন আর ভালো রাখুন সবাই কে।

JAYANTA CHOWDHURY

Financial Planner

WE DEAL IN

- Retirement Planning
- Child Education planning
- Keyman Insurance
- Partnership Insurance
- Employer Employee Scheme
- Group Medical insurance
- SIP, FD, MIS, NPS etc

ABOUT ME

Director of :
JAYANTA FINANCE CORNER
Certified Financial Planner
CFP FPSB USA
Registration no 129118
MBA in Insurance and
Risk Management

INTRODUCTION

I am Second Generation Entrepreneur in Risk Management and Wealth Creation advisory.
We manage More than 1500 clients Portfolios.

CONTACT

9831216984 / 9038549284
jyntachowdhury@gmail.com

D Banerji AND PARTNERS LLP

ADVOCATES, SOLICITORSA AND LEGAL ADVISORS

Dibyayan Banerji

Advocate Supreme Court India
(Founder & Managing Partner)

C-3, Survey Park Santoshpur, Kolkata - 700075
Website : https://dbandassociates.in
Contact : +91 8100312223

ট্রান্স পুরুষদের অদৃশ্য লড়াই

— রাহুল মিত্র

জেন্ডার অধিকার কর্মী, ট্রান্স অর্গানাইজেশন টিসার
প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

পরিবার ও সমাজের মধ্যে পরিচয় প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ঃ

আমাদের সমাজ এখনো দুটি পরিচয়কেই স্বীকৃতি দিতে শিখেছে-পুরুষ ও নারী। এর বাইরেও যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে, যে মানুষগুলো নিজেদের ভেতর আরেকটি সত্য ধারণ করে বেঁচে থাকে, তাদের গল্পগুলো যেন চিরকাল অন্ধকারে ঢাকা পড়ে থাকে। এই লেখার মাধ্যমে সেই অন্ধকার সরিয়ে, চাপা পড়ে থাকা কণ্ঠগুলোকে তুলে আনার চেষ্টা করছি।

আমার নিজের জীবনী ধরি। ছোটবেলায় খেলাধুলায় আমি ছিলাম দুর্দান্ত, বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ, ফুটবল, ক্রিকেট খেলতাম। যে স্কুলে পড়তাম, তা ছিল কো-এডুকেশন, ফলে শিশুমনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি, আমি যেমন ছিলাম, তেমনভাবেই ছিলাম। কিন্তু যখন হাইস্কুলে উঠলাম, পরিস্থিতি বদলে গেল। আমাকে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো হলো, বাধ্য করা হলো মেয়েদের ইউনিফর্ম পরতে। এখান থেকেই শুরু হলো আমার দুঃস্বপ্নের যাত্রা। আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না, যেন কোনো অদৃশ্য শেকলে বাঁধা পড়ে গেছি।

প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো এটা একটা সাময়িক অনুভূতি, সময়ের সঙ্গে কেটে যাবে। কিন্তু তা হলো না। বরং, যত বড় হলাম, তত বেশি বুঝতে পারলাম-আমি ভেতর থেকে পুরুষ, আমার সত্তা, আমার অস্তিত্ব পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে না। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠতে সময় লাগেনি। আর তখনই শুরু হলো শাসন, বিধিনিষেধ, অপমান আর অবজ্ঞার এক অন্তহীন অধ্যায়।

শৈশবে, যখন খেলাধুলায় পুরস্কার জিতে ফিরতাম, সবাই স্নেহের চোখে দেখত। কিন্তু বয়স বাড়তেই সেই ভালোবাসা কেমন যেন বদলে গেল। আত্মীয়দের তির্যক মন্তব্য, মা-বাবার কঠোর শাসন-সবকিছুই আমাকে যেন এক অদৃশ্য কারাগারে আটকে ফেলল। মা চাইতেন আমি যেন 'স্বাভাবিক' হই, কথাবার্তা, হাঁটাচলা, পোশাক সবকিছু মেয়েদের মতো করি। কিন্তু আমি তো সেটি পারতাম না, পারিনি।

আমি প্রথমে ভাবতাম, হয়তো আমি মানসিকভাবে অসুস্থ। না হলে আমার বিরুদ্ধে এত মানুষ কেন থাকবে? নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করেছি, বারবার নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। কারণ সত্যিটা এটাই-সমাজ যা শেখায়, তার বাইরেও একটা সত্য আছে। এবং সেই সত্যটিকে মেনে নিতে সমাজের সময় লাগে, সহ্যশক্তি লাগে, মন খুলে বোঝার মানসিকতা লাগে।

পরিবারের ভেতর থেকে এই লড়াই শুরু হলেও, আসলে এটি কেবল ব্যক্তিগত লড়াই নয় এটা একটি সামাজিক যুদ্ধ। একজন ট্রান্স পুরুষের জন্য নারী শরীর থেকে পুরুষ সত্তার স্বীকৃতি পাওয়া সহজ নয়।

একদিকে পরিবার ও সমাজের অবিরাম বাধা, অন্যদিকে নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে আপস না করার তীব্র সংগ্রাম। আমার জীবনের অনেক মূল্যবান বছর চলে গেছে এই পরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে। যখন আমার পড়াশোনায় মনোযোগী হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কথা ছিল, তখন আমি নিজের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছি। কোনো অপরাধ না করেও শাস্তি পেয়েছি।

তবে এই গল্প শুধু আমার নয়। আমার মতো আরও অনেক রাহুল আছে, যারা তাদের কণ্ঠকে চেপে রেখেছে, অথবা পরিবার-সমাজ তাদের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছে। এই লড়াই একার নয়, এই লড়াই আমাদের সবার, যারা নিজেদের সত্যিকারের পরিচয়ের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

আজ এই পত্রিকার মাধ্যমে আমি শুধু আমার গল্প বলছি না, বরং ট্রান্স পুরুষদের সেই চাপা পড়ে থাকা কণ্ঠগুলোকে মুক্ত করতে চাই। আমাদের কথা শোনার সময় এসেছে, আমাদের গল্প বলার সময় এসেছে। আর সেটাই হবে আমাদের সত্যিকারের স্বীকৃতির শুরু।

এবার সাজবে তুমিও

— সোনা
সেলিব্রিটি মেকআপ আর্টিস্ট

এই পৃথিবীতে সেই বৈদিক যুগ থেকেই চলে আসছে নারী ও পুরুষ উভয়ের সমান সমান রূপ চর্চা ও সাজ সজ্জা। পুরুষ নারীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। অলংকার এর সাথে সাথে রূপচর্চায় ব্যবহার করতে বিভিন্ন রকম উপকরণ যেমন আলতা চন্দন অগরু কাজল পুরুষের রূপচর্চার অঙ্গ ছিল। অলংকার হিসাবে কানের দুল, গলার মালা, কোমর বন্ধনি তাছাড়া বিভিন্ন রকম গহনা পরে সেজে উঠত।

আধুনিক সমাজে নারীর সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের রূপসজ্জার ও সমান গুরুত্ব পায়। পুরুষও পছন্দের পোষাকে সাথে সাথে পছন্দের অলংকার এবং প্রসাধনী ব্যবহার করে থাকে। তবে সাজ গোজ মানে এক গাদা রঙ মাখা নয় ত্বকের সঠিক পরিচর্চা। যেমন D-ট্যান। ফেসিয়াল তাছাড়া এখন বিভিন্ন রকম আধুনিক ট্রিটমেন্ট দিয়ে ত্বক টান টান রাখা, চুলের সঠিক কাটিং অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার সাথে আই-ব্রো কাটিং করা উচিত। ক্যারণ আমাদের সকলের নজর যায় প্রথমেই চোখ, ঠোঁট তারপর চুলের দিকে। তাই তো কত বছর আগে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যা চুলটা আঁচড়ে আয় না হলে ক্ষ্যাপার মতো লাগছে। তাই চুল থেকে নখ শরীরের প্রতিটা অংশের যত্ন খুব দরকার।

তাছাড়া বিয়ের সময় কনের ভারী মেক-আপের পাশে বরের মার্জিত সাজ না থাকলে বর ও কনের ছবিগুলো খুব একটা ভালো আসে না। তাই কনের পাশে বরের মেক-আপ ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিজস্ব বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ত্বক, চুলের যত্ন নিন ও মেক-আপ আর্টিস্ট এর কাছে প্রয়োজনে মেক-আপ করান।

(১) পুরুষরা নিয়মিত বিউটি পার্লারে (Salon) গিয়ে পেডিকিওর মেনিকিওর, ফেসিয়াল, ওয়্যাক্সিং ও হেয়ার কাটিং করাবেন।

(২) সূর্যের আলোয় বেরোনোর আগে যেকোন একটা সান গার্ড (SPF) লাগানো উচিৎ।

(৩) পুরুষদের ত্বক অনেক বেশী দূষণে যায় যেমন বাইক চালানোর সময় প্রচুর হাওয়া মুখে লাগে তাতে ত্বক শুকিয়ে যায়। মানে ডিহাইড্রেট হয়ে যায়। এইজন্য ত্বকে টোনার লাগানো খুব গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) যেকোন বয়সে একটি ভিটামিন-সি জাতীয় ক্রীম বা সেরাম লাগানো দরকার।

(৫) পুরুষরা প্রায়শই হেলমেট ব্যবহার করে থাকে। তারজন্য সপ্তাহে তিন শ্যাম্পু ও প্রতিদিন স্ক্যাপ টোনার লাগানো দরকার।

শরবত

— ফুডকা

গরমকাল পড়লেই বাঙালির মনে আর কিছু আসুক না আসুক, শরবত ব্যাপারটা চলে আসে। এখানে শরবত মানে আমি কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবে ভাবছি- যার মধ্যে ফলের রস দিয়ে বানানো মকটেল আছে, আইসক্রিম শুধু ফ্রুট পাঞ্চ আছে, সিরাপ দিয়ে বানানো সেই ঠান্ডা ঠান্ডা মন ভালো করে দেওয়া পানীয় আছে... অনেক কিছু আছে।

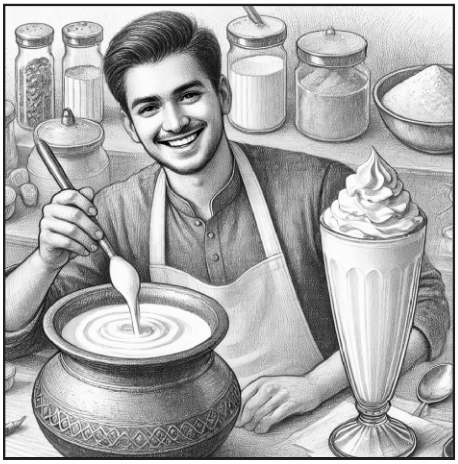

শরবত ব্যাপারটার সঙ্গে আমাদের পরিচয় কিন্তু আজ থেকে নয়। যে সময়ে সময় গোনা হতো না - মানে মহাভারত বা গোবিন্দ লীলামৃততেও আমরা শরবতের উল্লেখ দেখতে পাই। বলা হয় যে তখনকার দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্যে অনেক রকম মশলাপাতি, আখের রস ইত্যাদি মিশিয়ে একটা শরবত বানানো হতো। শ্রীকৃষ্ণ সেটিকে অত্যন্ত পছন্দও করতেন। এখন থেকে বহু বছর আগের মুসলিম সাহিত্যে আমরা সেই শরবতের উল্লেখ দেখতে পাই। এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফলের রস, মশলাপাতি, ফুলের রস.... সবকিছু মিলিয়ে এটিকে বানানো হত। ‘শরবত’ শব্দটি কিন্তু এসেছে একটি আরবী শব্দ ‘শরীবা’ থেকে। শরীবা শব্দটির ইংরেজি মানে হচ্ছে 'to drink' – এর উল্লেখ পাওয়া যায় আজ থেকে বহু শতক আগে কোনও এক প্রাচীন যুগে লেখা সেই আরব্য রজনীর গল্পে।

আজকের ওটোমান তুর্করা বহু যুগ আগে থেকেই তাদের খাবারের মধ্যে প্রত্যেকটি খাবার আসার আগে বা পরে একটু শরবত চেখে দেখত। ব্রিটিশদের মধ্যে লর্ড বায়রন ১৮১৩ সালে শরবত নিয়ে একটি গোটা কবিতাই লিখে ফেলেন। যখন তিনি ইস্তাম্বুলে গিয়ে সেখানকার শরবত চেখে দেখেন, তখন তিনি সেটা লিখেছিলেন। কিন্তু তারও প্রায় দুই শতক আগে দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন শরবতের ব্যাপারে প্রথম লেখাটি লেখেন ১৬২৬ সালে। তাহলে কি শরবতটা এ দেশে ব্রিটিশরা এনেছিলেন? একদমই না। শরবত এ দেশে এনেছিলেন মহাসম্রাট বাবর। বাবরের জন্য সেই হিন্দুকুশ পর্ব্বত থেকে বরফ আনা হত। কী করে সে বরফ আনা হত, তা খোদায় মালুম বা তিনিই বলতে পারবেন। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চাপানো সেই বরফের সঙ্গে আরও যা যা আনা হত, তার মধ্যে ছিল গোলাপের পাপড়ি এবং অজানা কিছু ভেষজ ও ওষুধপাতি। সেই বরফের কিছুটা দিয়ে তৈরি হত কুলফিতে (যখন আমরা ভারতীয় খাবারের মধ্যে কুলফির উদ্ভব দেখতে পাই) এবং বাকিটা দেওয়া হতো শরবতে। সেই ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত এই গরম দেশে নবাবদের যে কতটা আরাম দিত, সেটা বলাই বাহুল্য। এমনকি এটাও বলা হয় যে তুরকি দেশের পূর্ব প্রান্তের গ্রামগুলোর মধ্যে যখন কোনও বিবাহ সংক্রান্ত দেনাপাওনার কথা ঠিক হয়, তখন শরবতের কথা সেখানে আসতেই হবে। আফগানিস্তানের

ক্ষেত্রেও বলা হয় যখন বরপক্ষ দেনাপাওনার দাবিদাওয়া করেন, তখন কনেপক্ষ যদি সম্মত হন, তাহলে তাঁরা বের করে আনেন সেই লম্বা গলাওয়ালা পাত্রগুলো, যাকে বলা হয় 'ইব্রিক'। এবং ইব্রিক থেকে যদি কনেপক্ষ একটু গোলাপের শরবত পান করেন, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা তাঁদের দাবিদাওয়ায় রাজী।

তো শরবত জিনিসটা আমরা বুঝতেই পারছি যে বেশ অনেক বছর ধরেই আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আছে আর কলকাতা তাতে পিছিয়ে থাকবে, তা তো হতে পারে না। কলকাতায় একটা সময়ে প্রচুর শরবতের দোকান ছিল। গরমকালে সন্ধ্যেবেলা ফুরফুরে হাওয়ায় হালকা মেজাজে কলকাতাবাসী যখন শরবতের গ্লাসে চুমুক দিতেন, আহঃ! মনে হত স্বর্গ এখানেই... স্বর্গ এখানেই...! কিন্তু কালের অমোঘ চক্রে সেই শরবতের দোকানও এখন ক্রমশ কমে আসছে। আজকের দিনে যেগুলি টিকে আছে, এবার আসুন সেগুলির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

কলকাতার শরবতের গল্প শুরু করতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় একশো বছরের কাছাকাছি। উত্তর কলকাতায় বিধান সরণীর পাশে সিমলা ব্যায়াম সমিতি বলে একটা জায়গা আছে। তার পাশে একটা আশ্চর্য দোকান ছিল। তার নাম ছিল 'কপিলাশ্রম'। ওখানকার নাম শুনেই বেশি আশা করবেন না, আর এখন তো একেবারেই নয়, তার কারণে পরে আসছি। দোকানটি দেওয়ালের মধ্যে একটি গলি বিশেষ। সামান্য দু'আড়াই ফুট জায়গা, তার মধ্যে ভদ্রলোক বসে থাকতেন। সামনে একটা বরফের চাঁই। হাতে করে গুলে বা বালতির মধ্যে হাত দিয়ে ঘেঁটে তিনি শরবত বানাতেন। তিন রকমের শরবত হত। তিন রকম বললে ভুল হবে... ম্ম্ম্... পাঁচ রকম। তার মধ্যে সাধারণ শরবতগুলো আছে, যেমন, কমলালেবু, আনারস, কাঁচা আম, গোপালের গন্ধযুক্ত। আরেকটি আছে কাঁচা আম, পুদিনা দিয়ে। কিন্তু এনার আসল খেল এই শরবতগুলো ছিল না। আসল খেল ছিল অন্য একটা শরবত যার নাম 'আবার খাই'। এই 'আবার খাই' শরবতটি ছিল পাতলা দইয়ের ঘোল। শরবত বলাটা ভুল হবে, আবার লস্যির যে গাঢ়ত্ব হয়, এটি তার ধারে কাছেও যায় না। ঘোল বললেই বোধহয় তাকে ঠিক মতো বোঝানো যাবে। পাতলা দইয়ের ঘোল, আর তার মধ্যে সেই লুকোনো ছোট ছোট কাঁচের শিশি থেকে সেই ওস্তাদ মশাই যে কী মশলা ঢালতেন, তাঁর ওই চশমায় ঢাকা ঘোলাটে চোখের দিকে বা ওই গ্লাসের দিয়ে তাকিয়ে আমি ঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি। এটুকু বলতে পারি যে সন্ধ্যেবেলার ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে বা দুপুরবেলার প্যাচপ্যাচে গরমের মধ্যে সেই ঘোল খাওয়া মানে বেশ তুরীয় আনন্দ পাওয়া। 'আবার খাই' ছাড়া তারা আরেকটি জিনিস বানাতেন, তার নাম ছিল 'কেশর মালাই'। আবার ওই দুধের ঘোল, তার মধ্যে হালকা চিনি। বলে রাখা ভালো, তাঁর বানানো কোনও শরবতেই চিনি বেশি থাকত না; মিষ্টত্ব তাঁর ব্যবহারেও বিশেষ ছিল না আর তাঁর শরবতের মধ্যেও তেমন ছিল না। কিন্তু যেটুকু ছিল, সেটুকু ছিল একটি ভালো শরবতে যা থাকে।

'কেশর মালাই' নামেই বোঝা যাচ্ছে দইয়ের ঘোল, কেশরের সুগন্ধিওয়ালা। এক গ্লাসের দাম অত্যন্ত অল্প, পকেটে এমন কিছুই চাপ পড়ত না। একজন লোক দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দে একাই তিন চার গ্লাস খেয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু প্রত্যেক ওস্তাদের যা হয় আর কি...! ইনি সবাইকে সব জিনিস দিতেন না। মানে একেক বারে ইনি ছ'টি করে গেলাস বানাতেন। ফলে আপনারা তিন চারজন গিয়ে যদি বলতেন যে প্রত্যেকের একেক রকমের শরবত লাগবে, তিনি কিন্তু দিতেন না। একটু বেশি মাত্রায় লোকজন হলে তবেই দিতেন। এখন সেটাকে আপনি তাঁর over confidence ভাবুন বা যা ইচ্ছে, তাতে ওনারও কিছু যায় আসে না আর এত বছর পরে আমারও কিছু বলার নেই। কিন্তু কলকাতার শরবতের ইতিহাসে আমরা যদি এই কপিলাশ্রমের নাম না নিই, তাহলে ভগবান আমাদের কমা করবেন না। আজকে হয়তো সেই ভদ্রলোক তাঁর সেই দোকানটি নিয়ে আর নেই, কয়েক মাস আগে কোনও এক অদ্ভুত কারণে এই দোকানটি বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে চলে যায় কলকাতার দইয়ের ঘোলের জমানার এক অত্যাশ্চর্য ইতিহাস। বন্ধ হয়ে গেছে, ঠিক আছে; জীবনের সবকিছু সবসময় বেশি দিন থাকে না। কিন্তু কলকাতার শরবতপ্রেমীরা গরমকালে ওই চত্বর দিয়ে গেলে আজও বন্ধ দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে একবার যে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, সেটি বলাই বাহুল্য।

বাঙালির দইয়ের ঘোল তো হল, এবার একটু চলে আসুন পাঞ্জাবি শরবতে। ১৮৯৮ সালে পাঞ্জাবের এক উদ্যোগপতি ব্যবসায়ী র‍্যালি সিং অরোরা খুলে ফেলেন 'পাঞ্জাব শরবত হাউজ'। তাঁর লক্ষ্য ছিল, শহরে ভালো শরবত খাওয়ানো। এনাদের শরবত কিন্তু দইয়ের ঘোল নয়, এনাদের শরবত হত দু' ধরনের। একটি হচ্ছে দুধের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সিরাপ মিশিয়ে করা, আরেকটি হচ্ছে জলের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সিরাপ মিশিয়ে করা। পাঞ্জাব শরবত হাউজের মূলত সিরাপের ব্যবসা। তাঁরা হরেক রকমের সিরাপ দিয়ে হরেক রকমের শরবত বানান। এখনও তাঁদের দোকান টিকে আছে ধর্মতলায়। লিন্ডসে স্ট্রিটের দোকানটি কি আছে? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বুড়ো বয়সে আমার স্মৃতি আর অতটা সঙ্গ দেয় না, ফলে অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি। শরবতের সঙ্গে সঙ্গে এখানে বেশ কিছু চাট, রাজকচুরি ইত্যাদি বিক্রি হত। ছোটবেলায়, আমার মনে পড়ে, ওখানে গিয়ে আমি এক গ্লাস শরবত খেয়ে বাবার কাছে আবার আবদার করতাম একটা রাজকচুরি খাওয়ার জন্যে। খাওয়া-দাওয়াটা আমি বরাবরই ভালোবাসি। এখন আমার চেহারা দেখে নিন্দুকেরা অনেক কিছুই বলে থাকেন... সে যাক গে! তাতে আমি কান দিই না। কিন্তু রাজকচুরি খাওয়ার পরে দ্বিতীয় গ্লাস শরবতটির জন্যেও আমি যথেষ্ট বায়না জুড়তাম। এনাদের 'Rose শরবত'-টি ছিল আমার অত্যন্ত প্রিয়। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শরবতগুলোও যে প্রিয় ছিল না তা বলব না, কিন্তু এই Rose শরবতের মাহাত্ম্যটা আমি আজ পর্যন্ত ভুলে উঠতে পারিনি।

র‍্যালি সিং ছেড়ে আবার যদি আমরা উত্তর কলকাতার দিকে হাঁটা লাগাই, আমাদের কিন্তু চলে আসতে হবে বিকে পাল অ্যাভিনিউয়ের মুখে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, শোভাবাজার বিকে পাল অ্যাভিনিউ। সেখানে ট্রাম রাস্তার পাশে বেশ কিছু দোকান আছে যারা এখনও পুরনো আমলের মতো হাতে শরবত বানান।

এখানে এখনও শরবত বানানোর বা লস্যি গোলার মেশিন ব্যবহার করা হয় না। দু'জনরা বলে থাকেন, সন্ধ্যের দিকে অল্প একটু ভাঙের শরবতও পাওয়া যেতে পারে। তা সে ভাঙের শরবত পাওয়া যাক বা না যাক, গরমকালে আমের শরবত, সারা বছর কাঁচা আমের শরবত, শীতকালে একটু কমলালেবুর শরবত...

সবকিছুই এখানে পাওয়া যায়।

কিন্তু এখনও আমরা কলকাতার শরবতের যিনি শাহেনশা, যিনি এখনও অবধি একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁর ব্যাপারে আসিনি। তিনিও উত্তর কলকাতার। তিনি হচ্ছেন কলেজ স্ট্রিটে কলেজ স্কোয়্যারের পাশে ‘প্যারামাউন্ট’ বলে যে দোকানটি আছে, সেই ‘প্যারামাউন্ট’। ‘প্যারামাউন্ট’ নিয়ে কথা না বললে আমরা কিন্তু কলকাতার শরবত নিয়ে আলোচনাটা শেষ করতে পারব না। তখন ১৯১৮ সাল; হ্যাঁ, আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি সময় আগে। এক বাঙালি উদ্যোগপতি নীহার রঞ্জন মজুমদার একটি দোকান খোলেন কলেজ স্কোয়্যারের ঠিক পাশে; বলা হয়, এটি নাকি তখনকার দিনের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লুকনোর জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হত। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেখানে লুকিয়েছেন কিনা বা স্বাধীনতার লড়াই কী ভাবে এগিয়েছিল, সে খবরে গিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেও, আজও রমরম করে সে দোকান এগিয়ে চলেছে। ১৯১৮ সালটা ‘প্যারামাউন্ট’-এর এই শরবতের দোকানে বড় বড় করে বহু জায়গায় লাগানো আছে। সোম থেকে শনি প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই শরবতের দোকান খোলা। শীতকালে কয়েকটা মাস ছুটি থাকে। কারণ মজুমদার ফ্যামিলি বলেন, শীতকালে শরবতের অতটা চাহিদা থাকে না। তা সে তাঁদের ব্যাপার। গরমকালে যদি খেতে যান, তাহলে দেখবেন একচিলতে দোকান, বলা ভালো একটি সরু বারান্দার ফালি - তাতে ঢাকা দেওয়া কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন বিখ্যাত লোকের ছবি লাগানো আছে সেখানে। ফ্রেমে বাঁধানো শরবতের দাম লেখা। বেশ কিছু হরিণের মাথা সেখানে stuffed অবস্থায় আছে। শ্বেতপাথরের টেবিল, সরু বসার বেঞ্চি আর সঙ্গে অনেকখানি নস্ট্যালজিয়া। যতক্ষণে আপনি ওখানে পৌঁছচ্ছেন, ততক্ষণে প্রচণ্ড সম্ভাবনা আছে যে সেখানে গিয়ে দেখবেন সবসময় একটা অকথ্য ভিড়। মানে লোকজন বসার জায়গা পাচ্ছে না, তারা বাইরে ঘোরাঘুরি করছে, এরকম একটা অবস্থা। চিন্তা করবেন না, একটু দাঁড়িয়ে থাকুন। মজুমদার বংশ এখনও নিজের হাতে এই দোকানটা চালান। এবং যতদূর জানি, তাঁরা এখনও কোনও করমচারী রাখেননি শরবতগুলো বানানো বা পরিবেশন করার জন্য। সবটাই তাঁরা নিজের হাতে করেন। ফলে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গেলে তাঁরা যেরকম ভাবে আপনাকে যত্ন করে ডেকে খাওয়ান, এখানেও সেরকম একটা ব্যাপার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যতক্ষণ আপনি সেই ছাপানো ফর্দটি দেখছেন, যতক্ষণ আপনি সেই রংবেরঙের মেনু কার্ডের বিভিন্ন দাম দেখছেন, ততক্ষণ ওনাদের ‘ডাব শরবত’-টি অর্ডার দিয়ে দিন। লোকে বলে, ডাব শরবতের রেসিপিটি নাকি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলে দিয়েছিলেন। ডাবের জল, ডাবের শাঁস, সব মিশিয়ে তার মধ্যে বোধহয় একটু ভ্যানিলা এসেন্সও দিয়ে একটা গ্লাসে করে যখন আপনার সামনে আসবে, আপনি প্রথমে কনফিউসড থাকবেন যে প্রথমে চামচ দিয়ে শাঁসটা খাবেন, নাকি ডাবের শরবতটা স্ট্রয়ে চুমুক দেবেন। সে আপনি কনফিউসড থাকুন, যে কোনও একটা দিয়ে শুরু করুন, তাতে কিছু যায় আসে না। দু’ চুমুক খাওয়ার পরেই কিন্তু আমার মতো পাপিষ্ঠরা মনের মধ্যে একটু কুচিন্তা এনে ফেলে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটু ভডকা মিশিয়ে খেলে... ম্ ম্ ম্ ...! চিন্তা করবেন না, প্যারামাউন্ট সেই ব্যবস্থাও করে রেখেছে। না, ভডকার নয়, কিন্তু এই শরবতটিকে প্যাক করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার। ফলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফ্রীজে রেখে দিয়ে এনাদের যে কোনও শরবত যে কোনও সময়ে খাওয়া যায়।

ডাবের শরবতটা আপনি অবশ্যই ছাড়বেন না। আর তার পরেই যেটায় চলে আসবেন সেটা হচ্ছে এঁদের 'মালাই শরবত'। এখন নিশ্চয়ই আপনি এখান থেকে এক গেলাস শরবত খেয়েই বাড়ি চলে আসছেন না আর এক গেলাসের জন্য অত দূর যাওয়া আপনার পোষাবেও না। হ্যাঁ, কলেজ ছাত্রদের কথা আলাদা। তবে ইদানিং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের হাতে, আমি মাঝবয়সে ব্যবসা করেও যা টাকা রোজগার করি, তার থেকেও বেশি টাকাপয়সা থাকে। স্বচ্ছন্দে আপনি এনাদের তিন রকমের মালাই শরবত অর্ডার দিয়ে ফেলুন। একটা হচ্ছে 'Coco মালাই', একটা হচ্ছে 'Rose মালাই', একটা হচ্ছে 'Pineapple মালাই'... আর গরমকাল হলে 'Mango মালাই'। নামেই পরিচয়, বেশি বোঝাবার কিছু নেই। এর মধ্যে যদি পান তাহলে 'Mango মালাই'-টা অসাধারণ। আমের কুচি, আমের সিরাপ, আমের গন্ধ কী দিয়ে যে সেটা তৈরি হয়েছে বলা মুশকিল। অন্যগুলিকে সে বেশ কয়েক যোজন দূরত্বে দৌড়ে হারিয়ে দেয়। তারপরেই আমার নিজের পছন্দ 'Rose মালাই'। কারণ গোলাপের গন্ধ আমার বিশেষ প্রিয়। 'Coco মালাই'-টিও মন্দ যায় না। তবে আপনার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর যদি এতক্ষণ মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ মেরে গিয়ে থাকে, অন্যরকম খেতে চাইলে তার জন্যেও এনাদের option আছে 'কাঁচা আমের শরবত' এবং 'তেঁতুলের শরবত'। তেঁতুলের শরবতটি বেশ টক, জোরালো স্বাদ। যাদের এই তেঁতুলের জোরালো টক স্বাদ পছন্দ, কুচো বরফ ভাসিয়ে তাদের জন্য এই শরবত কিন্তু একদম আদর্শ। কুচো বরফ বা হালকা দই ভাসানো কাঁচা আমের শরবতটিও কিন্তু মন্দ না। যে কোনও দিনে কলকাতার বহু আচ্ছা আচ্ছা দোকানের লস্যি বা অন্যান্য নামজাদা দোকানের শরবতকে টেক্কা দেওয়ার মতো এখানকার শরবত। দাম হয়তো খুব একটা কম না, একটু বেশির দিকেই বলা যেতে পারে... 'বলা যেতে পারে' কেন - দামটা বেশিই। ৪০-৫০ টাকা থেকে শুরু করে প্রায় ১০০-১২০ টাকা অবধি শরবত আছে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আজকের দিনে জীবনের কোন আনন্দটা আপনি কম পয়সায় পেয়েছেন? আর কলকাতার একশো বছরের স্বাদ পাওয়ার জন্যে যেটুকু খরচা লাগে, সেটুকু খরচ তো আপনি যে কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কফিশপে বসেই করে ফেলেন। তো এখানে একটা ভালো জিনিস খাওয়ার জন্য কি সেটুকুও সম্ভব হবে না? এটাও কি আমায় মেনে নিতে হবে?

সত্যবতী ও রাজা শান্তনু

— শতায়ু মুখোপাধ্যায়

মহারাজ যখন রূপমুগ্ধ ধীবর কন্যা সত্যবতীর প্রতি
তখন কৌশলে একক উত্তরাধিকার চাই বলে শর্ত হাজির করলেন বিবাহযোগ্যা সত্যবতী।
এই শর্ত অন্য এক ক্যালকুলেশন, এক নারীর উত্তরাধিকারের হিসাব নিকাশ,
মহর্ষি পরাশরের সাথে বহুগামী হবার পরেও কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিতে হবে রাজত্ব, সম্পদ,
সুরক্ষা এবং বিকাশ।
মহারাজ শুধু রাজত্ব শাসন শিখেছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরাধিকারের হিসাব নিকাশ শিখে উঠতে
পারেননি বলেই সত্যবতীর শর্তে রাজি হয়ে গেলেন আপনে।
এভাবেই এক মহারাজের ভুল ক্যালকুলেশনে যে মহাভারত সেদিন শুরু হয়েছিলো আজও
তা চলছে অজস্র মহারাজের মননে!

লাইন টেনে বাঁচুন

— ডঃ পম্পা মৈত্র

স্বাস্থ্য বলতে আমরা শরীর ও মন উভয়কেই বুঝি। শরীর খারাপ করলে যেমন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিঘ্ন ঘটে তেমন মন খারাপ করলেও বিঘ্ন ঘটে। আমরা যখন খারাপ মন বা অ-স্বাস্থ্যকর মন নিয়ে কাজের জায়গায়, বাড়ীতে সকলের সঙ্গে থাকি, তখন তার প্রভাব সর্বত্র পড়ে। পরিবারে এবং কর্মক্ষেত্রে। যার ফলে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হয়।

আজকাল ক্লিনিকে এমন বহু মানুষ আসেন সম্পর্কের জটিলতা নিয়ে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। এতে মহিলা ও পুরুষ উভয়েই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সর্বোপরি সন্তান যে এই সম্পর্কের কিছুই বোঝে না, তার ক্ষতি হচ্ছে সবথেকে বেশী।

অনেক সময় দেখা যায় বিয়ের আগেই মহিলারা চাহিদার হোর্ডিং তৈরী করে এবং সেটা প্রথম দিন থেকেই বলতে থাকেন। অধিকাংশ চাহিদা পূরণ না হলেই চট্‌জলদি অন্য পন্থায় চলে যান।

যেহেতু পিতৃতান্ত্রিক দেশ আমাদের, অকূল পাথারে পরেন পুরুষেরা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বা ভাবতে গেলে তা তাঁদের প্রাপ্য নয়। সেই সময় মহিলাদের মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায় প্রতিপক্ষের দিকে আঙুল তোলা আর কত রকমভাবে বেকায়দায় ফেলা যায় তার পরিকল্পনা করা। টাকা পয়সা, আবেগ, সন্তানকে দিয়ে যতরকম ভাবে অক্টোপাসের মতো চেপে ধরেন। পুরুষ হাঁসফাঁস করতে থাকে। বিপর্যস্ত হন ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে। ফলে সার্বিকভাবে ভাববার ক্ষমতা তাঁরা হারান। প্রায়শই যুক্তিহীন ভাবে নিজেদের দোষারোপ করেন। বিভ্রান্তির শিকার হন। যা তাঁদের একেবারেই প্রাপ্য নয়।

তাই বলছি বিবাহের অর্থ কি আগে বুঝুন। বিবাহ একটা 'প্রতিষ্ঠান'। যেখানে দু'জনেই দায়বদ্ধ। দু'জনেই কিছু ছেড়ে কিছু নিয়ে একটা নতুন পিলার তৈরী করবে যা তাঁদের একান্ত নিজেদের, এই নতুন তৈরী সংস্কৃতি মানতে হবে, মেনে নিতেও হবে। দেখা যায় পুরুষেরা আগাম ভেবে নেন যে তাকে সর্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। পুরুষেরা কেন হোর্ডিং নিয়ে সম্পর্কে ঢুকতে পারেন না? তাঁরাও যে ঢুকতে পারেন সেই ধারনা তাঁদের নেই। পুরুষেরা ভাবেন বিবাহিত জীবন ও সম্পর্কের দায়িত্ব তার একার।

আসুন তাহলে সম্পর্ক তৈরী করবার আগে কয়েকটি স্থিতি মাপ (Parameter) এর কথা ভাবি।

১। নমনীয় কিনা

২। সহযোগিতা বোধ আছে কিনা।

৩। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব আছে কিনা।

৪। বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা করবার মতো কিনা।

৫। জীবনে অভিভাবকের ভূমিকা।

আমরা যদি এই স্থিতি মাপগুলো দেখে নিই তাহলে হয়তো বিবাহিত সম্পর্কের স্থায়িত্ব বাড়ানো

যেতে পারে।

সন্তান নেবার আগে দাম্পত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। তা না হলে অনেক সময় দেখা যায় অসহিষ্ণু বাবা, মায়ের আচরণের শিকার হয় বাচ্চাটি। বাচ্চাটি সম্পর্কের এই টানাপোড়েন বিন্দু বিসর্গ বুঝতে পারে না। কিন্তু যন্ত্রণা ভোগ করে। এক্ষেত্রে পুরুষ মানুষের যে একটা 'মন' আছে সেটাই গোচরে আসে না। খারাপ, ভালো তো পরের কথা। এক্ষেত্রে ইমোশানাল, সামাজিক ও আর্থিক অসম্ভব জাতাকলে পুরুষদের পড়তে হয়।

আইনানুগ পদক্ষেপ, সমাজ সংস্কার সব পরের কথা। এইসব করতে গেলে চাই জোটবদ্ধতা। কারণ জোটবদ্ধতা দিয়ে একজন পুরুষ পারেন এই ঝড় মোকাবিলা করতে।

পুরুষেরা সব দায় তাঁর ভাবেন বলে বিয়ের আগেই আগাম ভাবনা ভাবতে থাকেন। ফলে ছোট বিষয় অনেক সময় বড় করে ভাবেন।

অফিসেও অনেক সময় পুরুষ কর্মীকে হেনস্থা হতে হয় মহিলাদের দ্বারা। পুরুষ ভাবেন তার সমস্যাকে কেউ আমল দেবে না। তাই তিনি ঘটনার মুখোমুখি হবার বদলে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। অনেক সময় দেখা যায় ওই সব মানুষেরা অসম্ভব মানসিক চাপের শিকার হন। যা তাঁর অভিপ্রেত বা প্রাপ্য কোনটাই ছিলো না।

অনেক সময় এটাও দেখা যায় যে স্ত্রী ও মায়ের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে পুরুষেরা জেরবার হয়ে যান। পুরুষেরা ভাবেন সর্বদায় তার। কিন্তু এমন হবে কেন বলতে পারেন? শাশুড়ি, বৌমার সম্পর্কের সমস্যা তাঁরা মুখোমুখি বসে সমাধান করুন। এ দায় ছেলের বা স্বামীর নয়।

আজকাল অনেক সময় শোনা যায় 'বৌ' আমার মেয়ের মতো, গোল বাধে এখানেই। 'বৌ'কে 'বৌ' এর মতই দেখতে হবে। পরিবারের সদস্য তিনি। তাঁরও আলাদা প্রাপ্য সম্মান ও দায়িত্ব আছে। তা থেকে তিনি বিরত থাকবেন কেনো? 'শাশুড়িমা', 'মা' দুটো আলাদা সম্পর্ক। দুটো সম্পর্কই গুরুত্বপূর্ণ। শাশুড়ির প্রাপ্য সম্মান তাকে দেবো না কেনো? সম্পর্কগুলো যদি স্পষ্ট হয় হয়তো তাহলে জটীলতার জট অনেকটা কাটতে পারে।

সংখ্যাতত্ত্বের জাদু ঃ জীবন, ব্যক্তিত্ব আর সম্পর্কের রহস্য

— অনির্বাণ ব্যানার্জী

সংখ্যাতত্ত্ব (Numerology) এমন একটা মজার বিষয়, যা সংখ্যার সাথে আমাদের জীবনের গভীর সংযোগ খুঁজে বের করে জন্ম তারিখ আর নামের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে। এটা আমাদের ব্যক্তিত্ব, জীবনপথ, সম্পর্ক আর ভবিষ্যতের দিশা দেখাতে সাহায্য করে।

ব্যক্তিত্ব আর জীবন পরিকল্পনার গুরুত্ব ঃ

সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের নিজের সম্পর্কে বুঝতে, শক্তি-দুর্বলতা চিনতে আর জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে দারুণ কাজে দেয়। এর মধ্যে লাইফ পাথ নম্বর আর ড্রাইভার নম্বর (মুলাঙ্ক) খুব গুরুত্বপূর্ণ।

- **লাইফ পাথ নম্বর ঃ** পুরো জন্ম তারিখ থেকে বের করা হয়, যা বলে আমরা জীবনে কোন পথে চলব, কী গুণাবলী আছে আর কীভাবে সফল হতে পারব।
- **ড্রাইভার নম্বর (মুলাঙ্ক) ঃ** জন্মদিনের সংখ্যার যোগফল, যা আমাদের মুল ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা আর নিজেকে প্রকাশের ধরন জানায়।

যেমন, ড্রাইভার নম্বর ১ এর মানুষরা স্বাধীন, আত্মবিশ্বাসী, আর সবসময় নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করে। এভাবে নিজেদের ভালোভাবে বুঝতে পারলে জীবন আর সম্পর্কের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ হয় সম্পর্কে।

সংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব ঃ

সংখ্যাতত্ত্ব শুধু নিজেকে বোঝার জন্য নয়, বরং সম্পর্কের গভীরতা আর মানসিকতা বোঝাতেও দারুণ দুইজনের লাইফ পাথ আর ড্রাইভার নম্বর মিলিয়ে বোঝা যায়, কে কেমন, কীভাবে ভাবছে, আর সম্পর্কের সমস্যা কিভাবে সামলানো যাবে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ

- ড্রাইভার নম্বর ৫ (অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী, স্বাধীন) আর ড্রাইভার নম্বর ৬ (পরিবার-প্রেমী, যত্নশীল) মিলে মজার আর ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে এভাবে সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি, ঝামেলা বা মান-অভিমান সহজেই মেটানো যায়।

শাহরুখ খানের সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণ ঃ

শাহরুখ খান-এর লাইফ পাথ নম্বর ৭ আর ড্রাইভার নম্বর ২ এর মিশ্রণ বেশ চমকপ্রদ।

- **লাইফ পাথ ৭ ঃ** গভীর চিন্তাশীল, অধ্যয়নপ্রবণ আর আধ্যাত্মিক তাঁর জীবন আর ক্যারিয়ারে সবসময় গভীরতা আর সত্যের সন্ধান দেখা যায়।

- **ড্রাইভার নম্বর ২ ঃ** তাকে মিষ্টি, সহানুভূতিশীল আর কূটনৈতিক বানিয়েছে তার রোমান্টিক ও আবেগী চরিত্রে এই নম্বরের প্রভাব স্পষ্ট ।

এই দুই নম্বরের কম্বিনেশনে এমন একজন মানুষ তৈরি হয়েছে, যাঁর ব্যক্তিত্বে আবেগ, বুদ্ধি আর আন্তরিকতার মিশ্রণ আছে-একজন অভিনেতার জন্য যা একেবারে আদর্শ ।

সংখ্যাতত্ত্বের পথে জীবনকে সহজ করুন ঃ

সংখ্যাতত্ত্ব শুধু ভবিষ্যত বলার বিদ্যা নয়, এটা আত্ম-অনুসন্ধান, ব্যক্তিগত উন্নয়ন আর সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত করতে দারুণ সহায়ক। এই জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা নিজেদের সম্ভাবনা চিনতে পারি, সম্পর্কের টানাপোড়েন সহজে মেটাতে পারি আর জীবনের পথে সঠিকভাবে চলতে পারি।

সংখ্যার রহস্য বুঝে জীবনকে আরও সুন্দর আর অর্থবহ করে তুলুন !

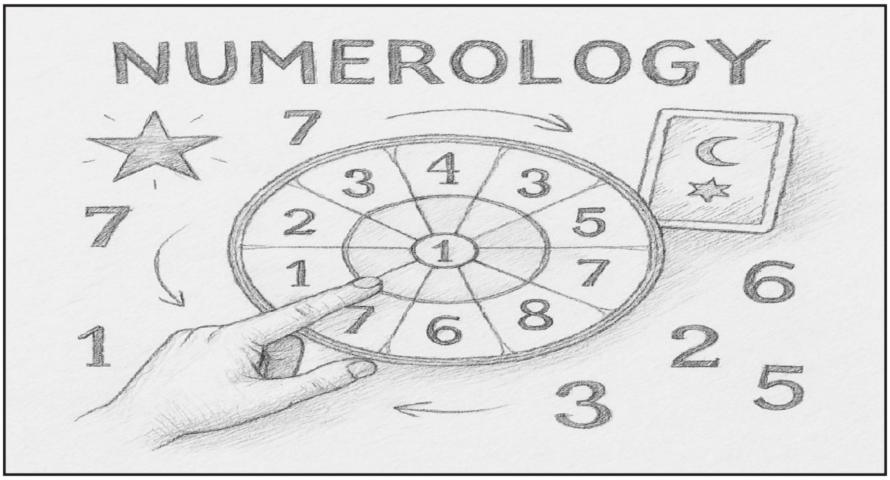

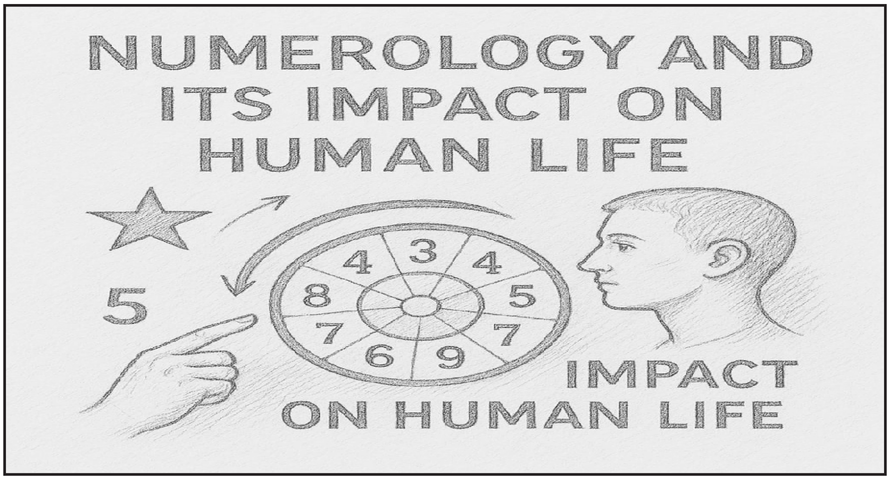

ভারতীয় সিনেমায় পুরুষের চাওয়া, পাওয়া, সুখ দুঃখ, বঞ্চনার কথা কেন উপেক্ষিত ?

— প্রসেনজিৎ বিশ্বাস

ভারতীয় বাংলা সিনেমা বলতে বোঝায়, অধৈর্য্য পরিপোক্ত। নতুনত্ব চাই, চলচ্চিত্র ভাষ্যমান হোক। সব সময় কেনো পুরুষ জীবনটাকে উৎসর্গ করবে, এমন হতে হবে, প্রথম ভালো লাগাটা নায়কের না, নায়কার হতে হবে, নায়ক নায়িকার জন্য সব সময় মরছে, নায়িকা কেনো মরছে না ? পুরুষ জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে, কার জন্য ? নারীর জন্য ! সিনেমায় প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের প্রাধান্য, সুবিশাল জায়গা দিচ্ছি। পুরুষ জেল খাটছে, মার খাচ্ছে, কষ্ট করছে, কাঁদছে, ভালোবাসা থেকে ছ্যাঁকা, বঞ্চিত পুরুষই হচ্ছে। দুঃখের ভাগটাও বেশি। বাস্তবে কেউ বিপদে পড়লে পুরুষই উদ্ধার করে তা নই, নারীরাও উদ্ধার করে। বাস্তবে নারী পুরুষের সমান অধিকার হয়, তাহলে বাংলা সিনেমাতেও হওয়া দরকার। আর নই পুরুষের হেনস্তা, যেমন বাস্তবে সময়কে অতীতে নেওয়া যায়না। কিন্তু সিনেমাতে চাইলে অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়া সম্ভব। তেমনি সিনেমায়ই যে একটা পুরুষই নায়ক হতে হবে তা নয়। নারীও নায়ক হতে হবে। এটাও হতে হবে বস্ত্র হরন শুধু নারীর নই পুরুষেরও হতে হবে। আমরা চাই সমতা, নায়ক হলেই যে তাঁর প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব জীবিকা নির্বাহী, এগুলো একটা নারীও পারে, কেনো আমরা নারীদের ওই জায়গাটা বারংবার দেখিয়ে দিচ্ছি, যে হ্যাঁ সে নারী তার ওটাই প্রাপ্য, ও পুরুষ, ওকে ওখানেই মানাবে। না এবার আমরা ভারতীয় বাংলা সিনেমাতে সামান্য নই অনেক খানি পরিবর্তন চাই। সিনেমাতে দেখা যায় একটা নারীকে ধর্ষণ করা হয়, তার প্রতিবাদ জানানোর জন্য, পুলিশ প্রশাসন সাংবাদিক জনগন, বিক্ষোভ করে। কিন্তু একটা পুরুষ বার বার ধর্ষণ হচ্ছে, পরিবারের কাছে, বন্ধুর কাছে, সমাজের কাছে, এমন কি ভালোবাসার মানুষটির কাছে, এটা দেখেও আমরা না দেখার চক্ষুবিনম্র করি। তখন তো থাকে না পুলিশ প্রশাসন, বাস্তব জীবনে সবাই সবার জায়গা নায়ক, যদি উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায়, ধরে নিলাম একটা রান্না প্রতিযোগিতা হচ্ছে, সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দুজন পুরুষ এবং নারী, সেখানে দেখালো রান্নাতে সুমধুর এবং

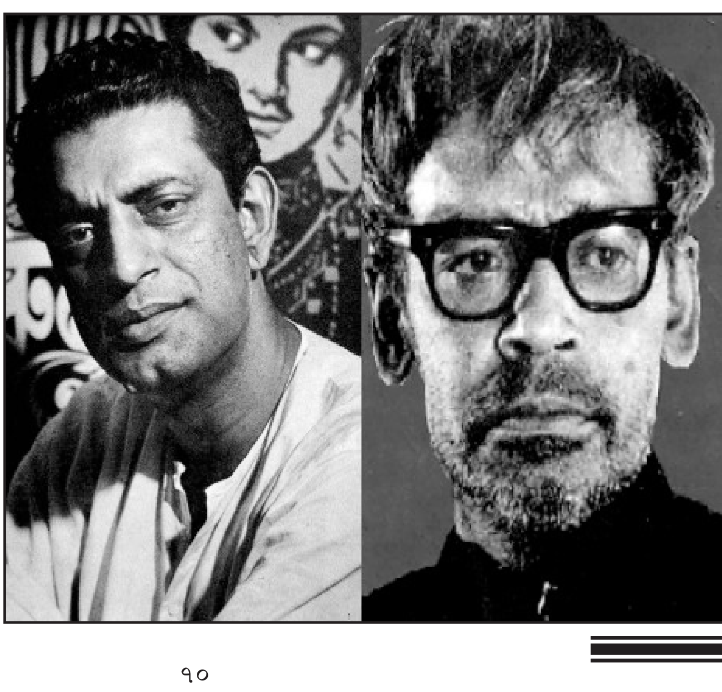

জয়ী হয়েছে পুরুষ, সেখানে কিন্তু নায়ক হিসেবে পুরুষকেই ধরা যাক। এদিকে একটা দৌড় প্রতিযোগিতায়, দুজন নারী এবং পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নারীটি জয়লাভ করল, তাহলে সেই স্থানে কিন্তু নায়ক হিসেবে গন্য হবে নারীকেই। আমাদের বাংলা সিনেমায় কেনো এত বৈষম্য, এখানে সব সময়ই পুরুষকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে অভিনয় করানো হচ্ছে। হোক না পরিবর্তন, যেখানে যেখানে পুরুষের হীনমন্যতা দেখানো হচ্ছে বা যুদ্ধের প্রথম প্রহরী বানাচ্ছে, সেখানে কেনো নারী হচ্ছে না বা হবে না। প্রতিটি লেখক লেখিকাকেও বলতে চাই, হোক সামান্য অতীত ভবিষ্যত। দেখা গেলে ভারতীয় বাংলা সিনেমাতে শুধু পুরুষকেই নির্যাতন করা হচ্ছে, আর সেই নির্যাতনে নারীদের ডোম বানানো হচ্ছে। সিনেমা হবে সমন্নয়তা, সিনেমা হবে সমানে সমান, সিনেমার প্রতিটি দুঃখ কষ্ট সুখ শান্তি ভাগাভাগি হবে দুটো জাতির মধ্যেই, যেমন একটা সংসারে শুধু দায়িত্ব

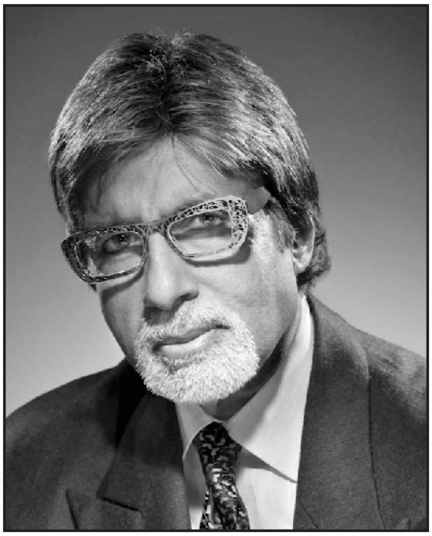

পুরুষের না নারীর সমান অধিকার থাকে গড়ে তোলার, ঠিক ভারতীয় বাংলা সিনেমাটাও গোটা সংসারের মত। যেখানে থাকবে শুধু সমনজারি, আর নই নারীদের প্রাধান্য বা সমষ্টিগত, এবার হতে হবে একটা চেয়ারে দুজন মানুষের বসার ব্যাবস্থা, হতে হবে পুরুষ উন্নয়ন, হতে হবে পুরুষ লঙ্ঘন, আমরা সিনেমাতে প্রতিটি নারীকে কেনো আকৃষ্টপূর্ণ ভাবে দেখবো, এবার থেকে তারা দেখবে, প্রতিটি লেখার মধ্যে এমন কিছু আনতে হবে যেখানে দৌড়টা নারীদের থাকতে হবে। আমি এমনটা বলছি না, যে নারী পুরুষের বস্ত্র ধারণ করুক এবং পুরুষ নারীর বস্ত্র ধারণ করুক। ব্যাস কর্মটার জায়গা পরিবর্তন আনতে হবে। এখন যদি মনে করেন কর্মের সঙ্গে সঙ্গে দুটি জাতির ব্যবধান হবে বা হতেই পারে। তাহলে ভুল, যদি কর্মের উপর ব্যক্তিত্বের ভেদাভেদ হতো, তাহলে রামকৃষ্ণ পরমহংসর কথা নিশ্চয় আমরা সকলেই জানি। থাক বেশি কথা বলে শুধু তর্কটা বাড়াতে চাই না, আমাদের শুধু লেখার ধারণা বদলাতে হবে, মানে পুরুষ নায়কই হবে সেটা না, কর্মটা ভেবে পুরুষ বা নারী নায়ক হবে। সিনেমা মানে দুঘন্টার বিনোদন নই। সিনেমা মানে জাগানো বা বদলনো সেটা হবে সমাজ কিম্বা অসমাজ, শুধু পুরুষকেই যে দৌড়াতে হবে এটা ঠিক নই। মাঝে মধ্যে নারীদেরও দৌড়ানোর অভ্যস্ত করতে হবে। তাদের ওই জায়গাটাতে দাড় করাতে হবে, তবেই ভারতীয় বাংলা সিনেমার সোনার ফসল সবার গোলায় প্রবেশ করবে। এখানে যে আমি নারীদের হীন্য করছি তা ঠিক না, আমি বোঝাতে চাচ্ছি যেটা হতে হতে হতেই যাচ্ছে, সেটাকে কেনো না একবার বন্ধ করে যেটা প্রয়োজন বোধহয়, বা নতুনত্ব আসে। শুধু আমি না, আমরা সকলেই চাই সিনেমাতে শুধু বিভাজন নারীকে বা পুরুষকে নিয়ে হোক, এখানে কেনো শুধু পুরুষই আঘাত জনিত অভিনয় করাতে হবে। সেখানে একবার নারীকে দাঁড় করিয়ে দেখলে কেমন হয়, প্রতিটি সিনেমাতেই তো দেখি নায়ক পুরুষ হচ্ছে, নারী হচ্ছে না কেনো। এটাও হতে বিভাজন, মোট কথা পুরুষকেও দেওয়া হোক যেটা আজীবন সিনেমা জগতে নারীকে দেওয়া হচ্ছে। আমি চাই বা আমরা চাই ভারতীয় বাংলা সিনেমাতে মূল যে ভেদ, সেটাকে সমষ্টিগত ভাবে, সমান প্রযোজ্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে সিনেমা মানেই বিনোদন, একবার ভাবুন

সিনেমা শুধু নারীরা না পুরুষরাও দেখে, ব্যাথা যদি দিতে হয়, দুজনেরই প্রাপ্য, যদি একে অপরকে ভালোবেসে পুরুষেরই ধংস হতে হয় বা জীবনে সুখের পাখিটা নারীকে দিতে হয়, হবে না সেটা পরিপূর্ণ সিনেমা। পরিপূর্ণতা পেতে হলে সুখের পাখিটা নারী পুরুষ দু'পক্ষপরই হতে হবে। ব্যাথাটাও দু'পক্ষেরই হতে হবে। বদলাতে হবে, বদল করতে হবে। জায়গাটা পরিবর্তন করতেই হবে। আর নই বাংলা সিনেমার নারী জাগ্রত, এবার থেকে হবে ভারতীয় বাংলা সিনেমার পুরুষ চক্ষু জাগ্রত। তবেই হবে স্বয়ং সম্পন্ন ভারতীয় বাংলা সিনেমা। দর্শকের জন্য, নিজেদের সিনেমাকে পরিবর্তন করার জন্য। প্রতিটি গল্পের মার্জনা থাকবে আর সেটা হবে পুরুষের পরিবর্তন। কেনো প্রথম ভালোবাসায় পুরুষের পড়তে হবে, এবং সেই ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কেনো না, সেই একই কাজটা নারী করুক, প্রথম ভালোবাসাটা নারীকেই দিয়ে শুরু হোক, পুরুষটাকে পাওয়ার কামনার জন্য যে সব কাজ গুলো পুরুষ করত সেগুলো নারী করুক, আজ প্রতিটি পদে পদে নারীদের রাখা হয়েছে সবর্ণ স্থানে, কেনো বারে বার শুধু বাংলা সিনেমাতেই নারীদের কাছে পুরুষ মাথা নতো করবে। যুদ্ধ করবে, সমাজের সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে পরিপাটির নড়াবে, এটা নারীও করতে পারে, কেনো এই পরিবর্তন আনলে কি বাংলা সিনেমা হারিয়ে যাবে, কেউ দেখবে না। তার মানে বোঝা হচ্ছে হালের বলদ পুরুষই হবে, নারীরা নয়? এটা ভুল, এবং সিনেমা তো সিনেমাই হবে। চাইলে শক্তি সবাই দেখাতে পারবে, ব্যাস লেখার ধরণটা বদলাতে হবে। শুধু কি পুরুষই কষ্ট দুঃখ বেদনা মান অপমান মারধর খেয়েই যাবে, এগুলো কি নারীরা পারে না? হয়তো সামান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় নারীর অবদান, কিন্তু সেটা নারী হিসেবেই ধরা হয়, সেখানে নায়ক হিসেবে না। বাস্তব জীবনে যদি প্রতিটি মানুষই তার কাছে নায়ক হয়ে থাকে, তাহলে সিনেমার ক্ষেত্রে নয় কেনো, কারন সিনেমা তো বাস্তবটাকে ধরেই হই। ঘটে যাওয়া আর ঘটার মধ্যে অনেকখানি ফারাক থাকে। আমার বা আমাদের শেষ কথা হলো ভারতীয় বাংলা সিনেমাতে নারীদের সুবিশাল জায়গা থেকে এবার নড়ন চড়ন করতে হবে। তবেই হবে ভারতীয় বাংলা সিনেমার সঠিক চিন্তা ও সঠিকভাবে বিশ্লেষণ বা পদক্ষেপ।

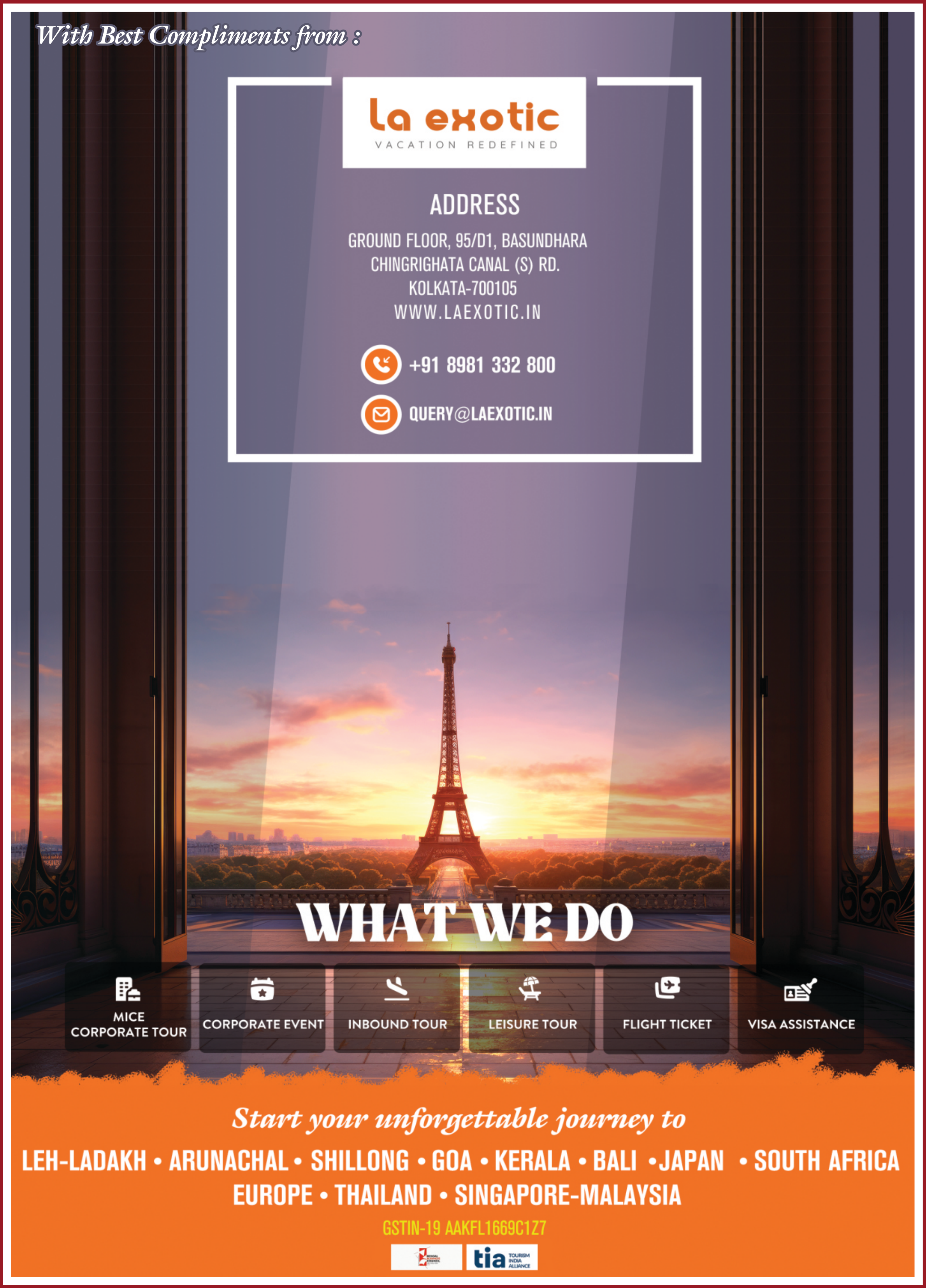

With Best Compliments from :
la exotic
VACATION REDEFINED
ADDRESS
GROUND FLOOR, 95/D1, BASUNDHARA
CHINGRIGHATA CANAL (S) RD.
KOLKATA-700105
WWW.LAEXOTIC.IN
+91 8981 332 800
QUERY@LAEXOTIC.IN
WHAT WE DO
MICE
CORPORATE TOUR
CORPORATE EVENT
INBOUND TOUR
LEISURE TOUR
FLIGHT TICKET
VISA ASSISTANCE
Start your unforgettable journey to
LEH-LADAKH • ARUNACHAL • SHILLONG • GOA • KERALA • BALI • JAPAN • SOUTH AFRICA
EUROPE • THAILAND • SINGAPORE-MALAYSIA
GSTIN-19 AAKFL1669C1Z7
tia TOURISM INDIA ALLIANCE

ALL BENGAL MEN'S FORUM

A★B★M★F

+91 9007557333 / +917003777280

+917003624865 / +91 9830062735

+919163679830

E-mail : allbengalmensforum@gmail.com

“পার্সোনাল লোন ও ক্রেডিট কার্ড ঃ সহজ EMI নাকি মৃত্যুফাঁদ?”

— জয়ন্ত চৌধূরী
Financial Planner

আজকের দ্রুতগতির জীবনে, মানুষের ব্যয়ের ধরন উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে অনেকেই নিজের প্রয়োজনের বাইরে খরচ করছেন। এটি বিশেষভাবে দেখা যায় বিয়ে, ভ্রমণ ও লাইফস্টাইল সংক্রান্ত খরচে।

অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা

সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ

আগে যেখানে মধুচন্দ্রিমা মানেই স্থানীয় কোনো পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণ ছিল, এখন তা বিদেশ ভ্রমণে রূপ নিয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী বাঙালি বিয়ে, যা একসময় সংস্কৃতির প্রতীক ছিল, আজ তা সঙ্গীত, হলদি, পুল পার্টি এবং ব্যয়বহুল ফটোগ্রাফির জাঁকজমকে ভরপুর।

সহজে ক্রেডিট কার্ড ও পার্সোনাল লোন প্রাপ্তি ঃ

এখন তরুণরা সহজেই ক্রেডিট কার্ড পেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক আর্থিক শিক্ষার অভাবে তা ব্যবহার করছেন নিজেদের সামর্থ্যের বাইরে।

পার্সোনাল লোন পাওয়ার জন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না, তাই ব্যাংকগুলি বারবার ফোন করে লোন অফার করছে, যার ফলে মানুষ চাহিদা (needs) ও চাওয়ার (wants) মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না। EMI ফাঁদে লুকিয়ে থাকা বিপদ । এই ধরনের লোন মুহূর্তের খুশি দিলেও দীর্ঘমেয়াদে এটি বড় আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

EMI-এর বোঝা বাড়ার সাথে সাথে সংসার চালাতে সমস্যা হয়, যা দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। চরম পর্যায়ে, এই আর্থিক চাপের ফলে বিবাহবিচ্ছেদ এবং মানসিক সমস্যার মতো ঘটনাও বাড়ছে।

GIG অর্থনীতি ও আয়ের অনিশ্চয়তা ঃ-

বর্তমানে গিগ অর্থনীতিতে কাজের নিরাপত্তা খুবই অনিশ্চিত। এমএনসি-তে হঠাৎ ছাঁটাইয়ের ফলে অনেকেই সেই EMI-এর বোঝা বহন করতে পারেন না, যা আরও বড় সমস্যার সৃষ্টি করে।

সঠিক আর্থিক পরিকল্পনার গুরুত্ব ঃ

একজন Certified Financial Planner হিসেবে আমি তরুণদের প্রতি নিম্নলিখিত পরামর্শ দেব যাতে তারা EMI ফাঁদে পড়ে না যান ।

ঋণ পরিশোধে অগ্রাধিকার দিন

সর্বদা সবচেয়ে বেশি সুদের হারযুক্ত লোন আগে পরিশোধ করুন।

ক্রেডিট কার্ড ও পার্সোনাল লোনে প্রায়শই ৩০-৪০% পর্যন্ত সুদের হার থাকে, যা দ্রুত ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তোলে।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের জন্য বিনিয়োগ করুন।

প্রোস্টাটাইটিস এবং বর্ধিত প্রোস্টেট পুরুষদের প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে একটি

Dr. Mrinaal Kanti Biswas
(Nutrition & Wellness Consultant)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, স্বাস্থ্য বলতে ‘‘শুধুমাত্র রোগ বা শারীরিক দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়, বরং সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতার একটি অবস্থা’’ বোঝায়।

শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি ভুগছেন। সামাজিক প্রত্যাশা এবং ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ ভূমিকা পুরুষদের শারীরিক স্বাস্থ্য এবং নির্দিষ্ট মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির উচ্চ হার এবং সামাজিক স্বাস্থ্যের ফলাফলের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে,

সকল শারীরিক স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে, প্রোস্টেট স্বাস্থ্য সমস্যা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পুরুষদের মধ্যে, পুরুষদের যৌনাঙ্গে প্রস্রাবের সমস্যা দেখা দেওয়ার সবচেয়ে সাধারণ স্থান হল প্রোস্টেট। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তিনটি অবস্থা প্রোস্টেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে যেমন বর্ধিত প্রস্টেট -সৌম্য প্রোস্ট্যাটিক হাইপারট্রফি (BPH), প্রোস্টাটাইটিস এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার, যার কারণ বার্ধক্য, জেনেটিক্স, জীবনধারা।

প্রোস্টাটাইটিস হল প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ এবং এটি সংক্রামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয় যা শরীরের অন্য কোন অংশ থেকে প্রোস্টেট আক্রমণ করে। বার্ধক্যজনিত হরমোনের পরিবর্তনও একটি কারণ হতে পারে। প্রদাহের ফলে প্রস্রাব ধরে রাখা সম্ভব। এর ফলে মূত্রাশয় ফুলে যায়, দুর্বল হয়, কোমল হয় এবং নিজেই সংক্রমণের জন্য সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। মূত্রাশয়ের সংক্রমণ সহজেই মূত্রনালী দিয়ে কিডনিতে প্রেরণ করা হয়।

তিন ধরণের প্রোস্টাটাইটিস আছে

- তীব্র সংক্রমণ প্রোস্টাটাইটিস,
- দীর্ঘস্থায়ী সংক্রামক প্রোস্টাটাইটিস,
- অ-সংক্রামক প্রোস্টাটাইটিস,

তীব্র সংক্রামক প্রোস্টাটাইটিস সাধারণত ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়। এর সূত্রপাত হঠাৎ হয়। লক্ষণগুলির মধ্যে থাকতে পারে অণ্ডকোষ এবং মলদ্বারের মধ্যে ব্যথা, জ্বর, ঘন ঘন প্রস্রাবের সাথে জ্বালাপোড়া, রক্তনালীতে পূর্ণতার অনুভূতি এবং প্রস্রাবে রক্ত বা পুঁজ।

দীর্ঘস্থায়ী প্রোস্টাটাইটিসও একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ। লক্ষণগুলির মধ্যে বারবার মূত্রাশয়ের সংক্রমণ ছাড়া আর কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে না।

অসংক্রামক প্রোস্টাটাইটিস ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের কারণে হয় না। এই প্রদাহের কারণ জানা যায়নি। লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ঘন ঘন প্রস্রাব, সম্ভবত ব্যথা সহ; বীর্যপাতের পরে ব্যথা; এবং তলপেটে ব্যথা। সব ধরণের প্রোস্টাটাইটিস, যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে পুরুষত্বহীনতা এবং প্রস্রাব করতে অসুবিধা হতে পারে।

বিনাইন প্রোস্টাটাইটিস হাইপারপ্লাজিয়া (BPH) হল প্রোস্টেটের ধীরে ধীরে বৃদ্ধি, যা সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সের পরে দেখা দিতে শুরু করে। ষাট বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের পঞ্চাশ শতাংশ এবং সত্তর বছরের বেশি বয়সী পুরুষদের নব্বই শতাংশের মধ্যে এটি হয়। পঞ্চাশ বছর বা তার বেশি বয়সের পরে, একজন পুরুষের টেস্টোস্টেরন এবং মুক্ত টেস্টোস্টেরনের মাত্রা হ্রাস পায়, অন্যদিকে প্রোল্যাকটিন এবং এস্ট্রাডিওল (এক ধরণের ইস্ট্রোজেন) এর মতো অন্যান্য হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটি প্রোস্টেটের ভিতরে ডাইহাইড্রোটেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যা টেস্টোস্টেরনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রূপ। এর ফলে প্রোস্টেট কোষের হাইপারপ্লাজিয়া (অতিরিক্ত উৎপাদন) হয়, যা শেষ পর্যন্ত প্রোস্টেট বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

যদি বৃদ্ধি খুব বেশি হয়ে যায়, তাহলে এটি মূত্রনালীকে বাধাগ্রস্ত করে, প্রস্রাবের সাথে ব্যাঘাত ঘটায় এবং মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপে খালি করার ক্ষমতা হ্রাস করে। যেহেতু মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপে খালি হতে পারে না, তাই কিডনিও যথারীতি খালি নাও হতে পারে। কিডনির উপর বিপজ্জনক চাপ সৃষ্টি হতে পারে। গুরুতর ক্ষেত্রে, চাপ এবং প্রস্রাবের পদার্থ উভয়ের কারণেই কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

মূত্রাশয়ের সংক্রমণ প্রোস্টাটাইটিস এবং বর্ধিত প্রোস্টেট উভয়ের সাথেই যুক্ত। প্রোস্টেট বৃদ্ধির প্রধান লক্ষণ হল ঘন ঘন প্রস্রাব করার প্রয়োজন, যা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। একজন পুরুষ রাতে প্রস্রাব করার জন্য নিজেকে বেশ কয়েকবার উঠতে পারেন। ব্যথা, জ্বালাপোড়া এবং প্রস্রাব শুরু করতে এবং বন্ধ করতে অসুবিধাও হতে পারে। প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি অস্বাভাবিক নয়।

প্রোস্টাটাইটিস সঠিকভাবে নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ উপযুক্ত চিকিৎসা কারণের উপর নির্ভর করে। প্রোস্টাটাইটিস এবং বর্ধিত প্রোস্টেট পরীক্ষায় সাধারণত একটি ডিজিটাল রেকটাল পরীক্ষা এবং একটি রক্ত পরীক্ষা জড়িত থাকে যা প্রোস্টেট-নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন (PSA) এর মাত্রা পরীক্ষা করে, যা প্রোস্টেট দ্বারা নিঃসৃত একটি প্রোটিন। লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই যথাযথ চিকিৎসা হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, তবে একই সাথে সঠিক পুষ্টি গ্রহণের পাশাপাশি জীবনযাত্রার ধরণ পরিবর্তন করাও গুরুত্বপূর্ণ।

এবার একটু আলোচনা করা যাক কিভাবে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের মাধ্যমে সমস্যাগুলি প্রতিরোধ এবং সংশোধন করা যায়ঃ

- **কোয়ারসেটিনঃ** একটি প্রদাহ-বিরোধী এবং টিউমার-বিরোধী ফ্ল্যাভোনয়েড।
- **সেলেনিয়াম ঃ** অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রোস্টেট গ্রন্থির সাথে সম্পর্কিত বিষাক্ত ক্ষতি থেকে কোষকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

- **ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ঃ** সমস্ত কোষীয় কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয়। অ্যান্টিস্ট্রেস ভিটামিন এবং ক্যান্সার-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
- **জিঙ্ক ঃ** বিপিএইচ, প্রোস্টেটাইটিস এবং এমনকি প্রোস্টেট ক্যান্সারের সাথেও এর অভাবের সম্পর্ক রয়েছে।
- **প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড (মাছের তেল) ঃ** প্রোস্টেট ফাংশনে গুরুত্বপূর্ণ।
- **ভিটামিন সি ঃ** রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নিরাময়ে সহায়তা করে।
- **ম্যাগনেসিয়াম প্লাস ক্যালসিয়াম ঃ** প্রোস্টেট ফাংশন উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ।

কিছু ভেষজ প্রোস্টেট সুরক্ষায়ও সাহায্য করতে পারে। আসুন আমরা সেই ভেষজগুলির সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি ঃ

- মূত্রবর্ধক ভেষজ বুচু এবং কর্ন সিল্ক দিয়ে তৈরি চা সহায়ক।
- ইচিনেসিয়া ইচিনেসিয়ার অ্যান্টিভাইরাল এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সংক্রমণ কমাতে সাহায্য করতে পারে।
- স পালমেটো প্রোস্টেট বৃদ্ধি এবং প্রদাহ, বেদনাদায়ক বীর্যপাত, কঠিন প্রস্রাব এবং এনুরেসিস (প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা) চিকিৎসার জন্য স পালমেটো ব্যবহার করা হয়। এটি প্রোস্টেট গ্রন্থির হরমোন উদ্দীপনার পরিমাণ হ্রাস করে প্রোস্টেট বৃদ্ধি হ্রাস করে।
- ক্র্যানবেরি জুস বেশি করে ক্র্যানবেরি জুস পান করুন, এটি মূত্রনালীর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে যা কিছু ধরণের প্রোস্টাটাইটিসের সাথে যুক্ত।

এবার জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক ঃ

- আপনার জীবনধারা থেকে তামাক, অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় (বিশেষ করে বিয়ার এবং ওয়াইন), ক্যাফিন, ক্লোরিনযুক্ত এবং ফ্লোরাইডযুক্ত জল এবং মশলাদার এবং জাঙ্ক ফুডের মতো জিনিসগুলি বাদ দিন।
- আপনার ওজন বেশি হলে আপনার ওজন কমানোর চেষ্টা করুন।
- কীটনাশক এবং অন্যান্য পরিবেশগত দূষণকারী পদার্থের সংস্পর্শে আসা সীমিত করুন।
- খুব ঠান্ডা আবহাওয়ার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন।
- যদি আপনার প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে থাকে, তাহলে ঠান্ডা লাগা বা অ্যালার্জির ওষুধ ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন। এই পণ্যগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এমন উপাদান রয়েছে যা এই

অবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং প্রস্রাব ধরে রাখার কারণ হতে পারে।

- যদি আপনার প্রোস্টাটাইটিস থাকে, তাহলে আপনার তরল গ্রহণের পরিমাণ বাড়ান। প্রস্রাবের প্রবাহকে উদ্দীপিত করার জন্য প্রতিদিন দুই থেকে তিন লিটার স্প্রিং বা ডিস্টিলড ওয়াটার পান করুন। এটি সিস্টাইটিস এবং কিডনি সংক্রমণের পাশাপাশি ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

- নিয়মিত ব্যায়াম করুন। তবে সাধারণ সিট দিয়ে সাইকেল চালাবেন না; এতে প্রোস্টেটের উপর চাপ পড়তে পারে। বিশেষ সাইকেল সিট পাওয়া যায় যার কেন্দ্রস্থলে খোলা থাকে যাতে প্রোস্টেটের উপর চাপ না পড়ে। হাঁটা একটি ভালো ব্যায়াম।

চল্লিশ বা তার বেশি বয়সী সকল পুরুষের বার্ষিক মলদ্বার পরীক্ষা করা উচিত, যার সময় প্রোস্টেট গ্রন্থি পরীক্ষা করা হয়। পুরুষদের মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সারের প্রাথমিক সনাক্তকরণের জন্য বার্ষিক প্রোস্টেট গ্রন্থি পরীক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে একটি পিএসএ পরীক্ষা এবং সম্ভাব্য ডিজিটাল রেক্টাল পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সময়মত এবং সম্ভাব্য নিরাময়যোগ্য চিকিৎসার সুযোগ করে দেয়।

খেলার খবর

— অনির্বাণ সিনহা

আইপিএল ২০২৫ এর সময়সূচী সম্পূর্ণ ম্যাচ তালিকা ঃ

আইপিএল ২০২৫ এর ফাইনাল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে এবং হায়দ্রাবাদ কোয়ালিফায়ার ১ এবং এলিমিনেটর খেলাগুলি আয়োজন করবে।

২২ মার্চ, শনিবার কলকাতার আইকনিক ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়ামে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে আইপিএল ২০২৫ এর শুরু হবে।

আইপিএল ২০২৫ দল এবং গ্রুপ ঃ

গ্রুপ এ চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে), রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি), রাজস্থান রয়্যালস (আরআর), পাঞ্জাব কিংস (পিবিকেএস), কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) ।

গ্রুপ বি মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স (এমআই), গুজরাট টাইটানস (জিটি), দিল্লি ক্যাপিটালস (ডিসি), সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ (এসআরএইচ), লখনউ সুপার জায়ান্টস (এলএসজি) ।

প্রতিটি দল তাদের নিজস্ব গ্রুপ-এর অন্যদের সাথে দুবার এবং অন্য গ্রুপের একজন মনোনীত প্রতিপক্ষের সাথে দুবার খেলবে এবং লীগ পর্বে অন্য চারটি দলের মুখোমুখি হবে একবার। লীগ পর্ব শেষ হবে।

শীর্ষ চারটি দল প্লে-অফে খেলবে, শীর্ষ দুটি দল ২০ মে হায়দ্রাবাদে কোয়ালিফায়ার ১-এ মুখোমুখি হবে। ম্যাচের বিজয়ী দল ২৫ মে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে খেলবে।

এদিকে, লীগ পর্বে তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থান অর্জনকারী দলগুলি এলিমিনেটর ১-এ খেলবে এবং ম্যাচের বিজয়ী দল কোয়ালিফায়ার ২-এ কোয়ালিফায়ার ১-এর পরাজিত দলের সাথে ফাইনালে দ্বিতীয় দল নির্ধারন সামগ্রিকভাবে, আইপিএল ২০২৫-এর জন্য ১৩টি ভেন্যুতে ৭৪টি ম্যাচ নির্ধারিত রয়েছে। প্রথমবারের মতো ইডেন গার্ডেন আইপিএল ফাইনাল আয়োজন করবে।

তিনটি দল তাদের হোম ম্যাচ দুটি ভিন্ন ভেন্যুতে খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালস (বিশাখাপত্তনম এবং নয়াদিল্লি), পাঞ্জাব কিংস (চণ্ডীগড় এবং ধর্মশালা) এবং রাজস্থান রয় ্যালস (গুয়াহাটি এবং জয়পুর)।

বিকেলের ম্যাচগুলি শুরু হবে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে এবং সন্ধ্যার ম্যাচগুলি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে।

মানুষ মানুষের জন্য

— ডাঃ শুভম মুখার্জি
কার্ডিওলজিস্ট
IPGMER and SSKM হসপিটাল

এখানে সব ডিপার্টমেন্টেরই চিকিৎসার জন্য ডাক্তার রয়েছেন।

নিয়মাবলী ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ

- 033 2440 5178211 এই নম্বরে কল করে টিকিট করিয়ে নেবেন।
- এখানে ৫ টাকার বিনিময়ে ডক্টর দেখানো যাবে।
- যে কোনো রোগ সংক্রান্ত চিকিৎসার যাবতীয় পরীক্ষা বিনামূল্যে বা 100 টাকার বিনিময়ে করানো হবে।
- OPD সময়সীমা সকাল 8 থেকে 12টা 30 পর্যন্ত। যদি পেশেন্ট বেশি থাকে, তাহলে যতক্ষণ পেশেন্ট দেখা শেষ না হয় ততক্ষণ ডাক্তারবাবু দেখবেন। সময়সীমাটাকে বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।
- পারলে সকাল সকাল লাইন দেওয়ার চেষ্টা করবেন।
- খাবার সুবন্দোবস্ত আছে। ২৫ টাকার বিনিময়ে থাকা ও খাওয়া সম্পূর্ণ করতে পারবেন।
- যেকোনো বড়ো অপারেশন খুব স্বল্প মূল্যে করা হয় এখানে।
- এখানে চিকিৎসার জন্য বেশিরভাগ ওষুধ বিনামূল্যে অথবা খুব স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাবে।
- এটা সম্পূর্ণরূপে খেটে-খাওয়া, দুঃস্থ, গরিব মানুষদের সেবাপ্রদানের স্বার্থে একটা ছোট প্রয়াস। কোনো দালাল বা দালাল মারফত টাকা আদান-প্রদান ও বুকিং সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ধৈর্য্য সহকারে শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনারা আসবেন, একজন রোগী একজন ডক্টরের কাছে ভগবান-তুল্য, আমরা আপনাদের সঠিক সেবা দানে সর্বদা সক্রিয় থাকব।
- এখানে সব রকমের চিকিৎসা হয় এবং সেটা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে।
- ঠিকানা এবং কন্ট্যাক্ট নম্বর...

1) 211, Rash Behari Avenue, Ballygunge, Kolkata, West Bengal
Ph. : 033 2440 5178, 211 Rash Behari Avenue, Ballygunge
Kolkata, West Bengal - 700019 (Bharat Sevashram)

2) Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, Kolkata-700103
West Bengal, India

৩) নিউটউন ইকোপার্ক, WESTIN এর বিপরীতে, আমার ফ্ল্যাটেই (Shapoorji & THE ONE RAJARHAT)

- খেটে খাওয়া মানুষের জন্য, মানুষকে বাঁচানোর জন্য সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন প্লিজ বিষয়টি সবার কাছে পৌঁছাক। আপনার সহায়তা বাঁচিয়ে দিক এক দুঃস্থ-অসুস্থ মানুষের প্রাণ। সর্বদাই আমরা মানুষের সেবা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। আপনাদের বলব আপনারাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন, কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ দিক থেকে, যে কোনোভাবে বিষয়টি আরো ভালো করা যায়...তার জন্য আপনাদের মতামত জানানোর আহ্বান করছি।

PROJECT APPROVED BY SBI HDFC BANK
AND OTHER LEADING BANKS | 9088040082

WBRERA/P/JAL/2023/000460 | www.rera.wb.gov.in

IEF INTERIORS & DEVELOPERS

ISO CERTIFIED: 9001 AND 14001

GST: 19AJVPS1997C1ZE

INDUSTRIAL EQUIPMENT FEEDER

OUR SERVICES

- Construction of Private Property (Residential / Commercial)
- Complete Interior Solution

❖ 2D Layout
❖ 3D Layout
❖ False Ceiling
❖ Flooring (Marble / Wooden / Epoxy/SPC)
❖ Painting
❖ Furniture
❖ Modular Kitchen
❖ Electrical Work
❖ Renovation Work
❖ Graphiti Work
❖ UPVC Work.

What Makes Us the Right Partner for You.

- We Provide Timely Hand Over of our Projects.
- We Use Quality Materials to last you a lifetime
- We will Meet Your Expectations in all Aspects.
- WE PROVIDE 1 YEAR WARRANTY FOR OUR SERVICES

Contact Us :

18, Ho Chi Minh Sarani, Behala
Kolkata - 700061
Ph : 7003609269 / 9831161650
Website : www.iefinteriors.com

About Us :

IEF INTERIORS IS SMART, REAL, TRUSTWORTHY. WE DO NOT BELABOR DESIGN TRENDS AND WE ALWAYS SPEAKAT THE TOP OF OUR INTELLIGENCE. WE QUESTION THINGS. WE WANT TO KNOW HOW THIS WORKS, WHY THIS ISHERE, WHO MADE THIS AND WHAT IT IMPACTS AND INFLUENCES, WE LIKE TO HAVE FUN, WE ARE PLAYFUL PLUS ELEGANT BECAUSE AFTER ALL, WE HAVE A LOT OF GOOD ENERGY COMING FROM ALL THE GOOD THINGS WESURROUND OURSELVES WITH. STARTED IN 2017, WE HELP YOU TO BUILD YOUR DREAM HOME, OFFICE, SHOP, SHOWROOM. WE STRIVE TO GIVE YOU THE BEST DESIGNS, QUALITY PRODUCT AND TOP NOTCH FINISH TO CONVERT YOUR DREAM INTO REALITY.
WE BRING YOU CREATIVE HOME DESIGN PRODUCTS THAT WORK TOGETHER BEAUTIFULLY TO FORM INSPIRED LIVING SPACES. GET THOUGHTFUL HOME INTERIOR DESIGN ELEMENTS THAT ADD REAL AND LASTING VALUE TO YOUR INTERIORS.
MAKE THE MOST OF COMPACT SPACES WITH SPACE SAVING FURNITURE THAT ARE INGENUOUS AND INNOVATIVE. TRANSFORM YOUR LIVING SPACES WITH INTERIOR DESIGNS THAT MAKE OPTIMAL USE OF AVAILABLE SPACE.